পরিক্রমা

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

উপন্যাস

১৩৫২

ডি, এম, লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কলিকাতা

মুদ্রাকর : শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮
আশ্বিন, ১৩৪৫

পরিক্রমা

১

বরুণা দত্ত টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কুশান কিনতে হবে। নতুন কত রকমের বেরিয়েছে, সবই পছন্দসই ব'লে পছন্দ করাই মুস্কিল। আর পরদা। আশ্চর্য, নতুন পরদায় ঘরে যেন নতুন আত্মা আসে। আর ফুল। ফুল কিছু বেশি ক'রেই কিনতে হবে। আর…

'কে, তুমি?'

'বলো।'

'আজ বিকেলে তোমরা এসে চা খেয়ো আমাদের এখানে।'

'কী ব্যাপার?'

'জন্মদিন। বাবলির।'

'ও, বাবলির জন্মদিন। কত বছর হ'লো ওর?'

'পাঁচ হ'লো।'

'পাঁচ! বলো কী!'

'এমনিই হয়। এসো কিন্তু ঠিক।'

'তা ছাখো...''

'কী ব্যাপার? বিজনকে জিজ্ঞেস করবে? করো...আমি ধ'রে আছি।'

'না, না, জিজ্ঞেস করবার আর কী আছে? কেমন আছো তোমরা?'

'আছি ভালো।'

'অনেকদিন খোঁজখবর নেয়া হয় না তোমাদের—'

'আমরাও নিতে পারিনি। আজকালকার দিনে ওটা দোষের নয়, সুমি।'

'দাদা কেমন আছেন?' হঠাৎ সুমিতার স্বর একটু সুদূর শোনালো।

'আপাতত বাথরুমে আছেন।'

'দাদা আপিস থেকে একদিন টেলিফোন করেছিলেন। ঘুমুচ্ছিলাম। কেউ ডেকে দেয়নি।'

'লক্ষ্মী কান্তর নাকি হাম হয়েছিলো—'

'হ'য়ে গেলো এক চোট।'

'আচ্ছা। নন্তু আর বুলুকে এনো কিন্তু। কথন আসবে?'

'উনি কোর্ট থেকে ফিরবেন, তবে তো। ছটার আগে হবে না।'

'আচ্ছা। বিজনকে ভালোবাসা দিয়ো।'

বরুণা দত্ত টেলিফোন রেখে দিলে। শেষের কথাটা কেমন যেন শোনালো, মেকি, ইংরিজির তর্জমা। ভালোবাসা···! মনের ভাব অনেক, কথা একটাই। বিজন সম্বন্ধে তার যা মনের ভাব, কোন্ কথাটা ঠিক ঠিক হ'তো? 'বিজনের কুশল কামনা করি।' 'বিজনকে বোলো তাকে আমি মিত্র ব'লেই গণ্য করি—' (যদি পৃথিবীর সমস্ত লোককে শত্রু-মিত্র এই দুই ভাগে ফেলা যায়)। 'বিজনকে বোলো তার অস্তিত্ব আমি সব সময়ই একেবারে ভুলে থাকিনে।' যথেষ্ট নয় কোনোটাই, শেষেরটাও যথেষ্ট নয়। অনেক সময়ই আমাদের এই ধরা বুলিগুলো একেবারে অর্থহীন। কিছুই আমরা বলতে চাইনে···এবং উভয় পক্ষই সেটা জানে। ওকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। হায়রে ভালোবাসা!

স্যাণ্ডউইচ কি সে বাড়িতে তৈরি করবে, না দোকান থেকে আনাবে। ও জিনিসটা তার হাতে আসে মন্দ না। তা ছাড়া, দুটো টাকা বাঁচলে দুটো টাকাই বাঁচলো। পাৎলা একটু হাসি ফুটলো বরুণার ঠোঁটে, কথাটা মনে ক'রে। লোকে আজকাল তাদের···সঙ্গতিপন্ন ব'লেই জানে। সুমিতা মানসিক আড়চোখে তাকায়। অনেকেই তাকায়, সে জানে। কিন্তু সুমিতার তাকানোয় একটু বিশেষত্ব আছে। ওরা বড়োমানুষ। বিজন জমিদার। লাখ দুই আয় বুঝি বছরে। অনুপার্জিত অর্থের ডিমের উপর ব'সে-

ব'সে তা দিচ্ছে মোটা মুর্গির মত। বি-এ পাশ করেছে, বিলেত গিয়েছে, ডিনার খেয়ে বারিস্টর হ'য়ে এসেছে। ব্যারিস্টর-সাব! মিষ্টার গোস্, বার-অ্যাট-ল। কেবল টাকা যথেষ্ট নয়! চাই সামাজিক ছাপ: ভদ্র জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র। কিন্তু টাকা দিয়েই তো সেটা কেনা যায়। টাকাই যথেষ্ট। আইন থেকে বিজনের এক পয়সা রোজগার নেই, দরকার নেই তার, সেটা সে আশাও করেনি। এগারোটার মধ্যে কালো বো এঁটে সে হাইকোর্টে উপস্থিত, একটা থেকে তিনটে তার লাঞ্চের পালা, শেরির গেলাস নিয়ে গল্প-গুজব, চারটের সময় বাড়ি ফিরে ক্লান্তভাবে ঢ'লে পড়া। স্ত্রীর কাছে আত্ম-সম্মান বজায় রাখার জন্য এর চেয়েও কঠিন কাজ মানুষ করেছে। বরুণার এক দূর সম্পর্কের ভাই ছিলো, চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করতো। চাকরি গেলো তার, বৌকে বলতে সাহস হ'লো না। ঠিক সময়ে সে খেয়ে-দেয়ে বেরোয়, ঠিক সময়ে ফেরে। সারাটাদিন এখানে-ওখানে কাটায়, জাদুঘর ভিক্টরিয়া মেমোরিয়াল ছাখে, ময়দানে গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোয়। আর পুরোনো আপিসের স্যাঙাতদের কাছ থেকে দু' আনা চার আনা ক'রে ধার করে—আর এমনি ক'রেই পরের মাসের পয়লা ঠিক চল্লিশটি টাকাই বৌয়ের হাতে নিয়ে দেয়। কিন্তু এক মাস কাটলো, দু' মাস আর কাটলো না। বৌ টের পেয়ে গেলো। বেচারা ধরা প'ড়ে গিয়ে বললে, আর একটা চাকরি জোটাতে তো সময় লাগবে, তোমার একটা পয়সা যদি দাও তো—। বৌ বললে, লজ্জা করে না পুরুষমানুষ হ'য়ে বৌয়ের

গায়ের গয়নায় হাত দিতে? গয়না কি তুমি দিয়েছো যে তোমাকে দেবো? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারো না?' বৌ একটু লেখাপড়া শিখেছিলো বুঝি। অযোগ্য স্বামী দেরি করলে না, পরের দিনই দিলে গলায় দড়ি।

এ-রকম কতই তো ঘটছে আজকাল—অন্তত বাঙলা খবরের কাগজে তো কতই বেরোয়। সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা এ-সব, খবরের কাগজেরই উপযুক্ত। আমাদের মন দেবার সময় নেই। সৌভাগ্যের বিষয়, বিজন ঘোষের মাসে চল্লিশ টাকা রোজগার করবারও দায় নেই। যদি সে নিঃসম্বল হ'য়ে জন্মাতো, চল্লিশ টাকার কেরানিগিরিও কি জুটতো তার? না কি সুমিতাই তার মধ্যে অত সব আশ্চর্য গুণ আবিষ্কার করতো? না কি ফুটবল কি পলিটিক্স কি সাহিত্য সম্বন্ধে তার মতামত অমন নির্ভীকভাবে সে কখনো উদ্গার করতে পারতো? কিন্তু সকল বিষয়েই যে তার একটা মত আছে, এবং সে-মত যে প্রকাশযোগ্য, এই অধিকারই তো সে বিলেত থেকে কিনে আনলো।

'বিজনকে ভালবাসা দিয়ো।' শেষ মুহূর্তে কেন বরুণা বলতে গেলো কথাটা? ঐরকমই বলি আমরা এ পৃথিবীতে; কখনোই কি আমরা ঠিক মনের কথাটা বলি? 'বিজনকে বোলো তার অস্তিত্ব আমি সব সময়ই একেবারে ভুলে থাকিনে।' বিদ্রূপটা উপভোগ্য, কিন্তু সত্যিকারের কথাটা এর চেয়েও বেশি। সব সময়ই ভুলে থাকি,—অন্তত ভুলে থাকতে পারলে খুসি হই। ও-রকম মানুষের সঙ্গে বরুণার কখনো কোনোরকম ঘেঁষাঘেঁষি হবে এটাই তার

প্রতি ঘোরতর অন্যায় নয় কি? চোখে দেখা মাত্র অগাধ বিতৃষ্ণা হয়, এমন মানুষ এক বিজন ঘোষকেই সে দেখেছে। লাল আলুর মতো গাল, ছোটো মিটমিটে চোখ, আর জর্মানদের মতো মিহি ক'রে ছাঁটা চুল, আর ঐ বাচ্চা ভুঁড়ি যা বেশি দিন আর নাবালক থাকবে না! আর সব সময় ঐ আত্ম-সম্পূর্ণ, আত্ম-প্রীত ভাবটা— আমার চারদিকেই পৃথিবী ঘুরছে! অসহ্য! অসহ্য, তবু এই বিজনকেই মাঝে-মাঝে মনে না-ক'রে উপায় থাকে না। মেয়ের জন্মদিনে তাকে নিমন্ত্রণ করতে হয়, সে আত্মীয়।

বরুণা দত্ত কোনের ছোটো টেবিলটায় স'রে গিয়ে একটা ফর্দ লিখতে বসলো। স্মৃতিশক্তির উপর কত আর নির্ভর করা যায় না আজকাল। আগেকার দিনে সে কিছুই ভুলতো না। হনুমান যত সহজে এক লাফে সমুদ্র পার হয়েছিলো, তত সহজেই সে ছেলেবেলায় এক-একটা পরীক্ষা পার হ'য়ে গিয়েছে, তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জোরে। কোথায় কোন্ জিনিস রেখেছে কখনো গোলমাল হ'তো না, কোনো টেলিফোনের নম্বর এক-বারের বেশি বইয়ে দেখতে হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি দু' একবার এমন হয়েছে যে বাজার করতে বেরিয়ে আসল জিনিসটাই এসেছে ভুলে। আজকাল সে কিছু-কিছু ভুলতে আরম্ভ করেছে। তিরিশ প্রায় হ'লো। যৌবনের পরিণতির সঙ্গে মনের অন্যান্য সব ক্ষমতাই গভীর হয়, শুধু স্মৃতিশক্তিটাই আসে শিথিল হ'য়ে।

লম্বা দমের মতো ওটাও যেন কাঁচা বয়সেরই অনুষঙ্গ। যখন মনে রাখবার অনেক কিছুই থাকে, তখনই মনে রাখবার ক্ষমতা হ্রস্ব হ'য়ে আসে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেজন্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে আজকাল ভুলতে আরম্ভ করেছে।

কুশান ৮টা। না—বরুণা চোখ ঘুরিয়ে একবার ঘরটা দেখে নিলো—আপাতত ছ'টাতেই হবে। পরদা—কী রকম পরদা কিনবে? কোন্ এক বাড়িতে একবার দেখেছিলো একটা হলদে-কালো নক্সা, চিতাবাঘের চামড়ার মতো। মন্দ নয়। কিন্তু মুস্কিল, ঠিক ঐরকম হয়-তো সমস্ত মার্কেট ঢুঁড়েও এখন পাবে না। বাস্তবিক, এই জিনিস কেনা—

'রুনি, আমার রিমলেসটা কোথায়?'

বরুণা চোখ তুলে তাকালো। প্রশান্তর স্নান হয়েছে, পাজামার উপর ড্রেসিংগাউন জড়ানো। তার ফর্সা পরিষ্কার মুখে একটা অত্যন্ত সরল অসহায় ভাব। চশমা চোখে না থাকলে তাকে এইরকমই দেখায়, ঠিক ছেলেমানুষের মতো।

'তোমার ড্রেসিংটেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে।'

'ও। ভালো ক'রে না খুঁজেই তোমাকে জিজ্ঞেস করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

বরুণা টেবিলের উপর শোয়ানো তার ছোট্ট হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো।—'ন'টা চৌত্রিশ।' তারপর, যেন দুটো কথায় কোনো-রকম সম্পর্ক আছে, এইভাবে বললে: 'সুমিতাকে টেলিফোন করলাম এইমাত্র।'

'কী বললে সুমি ?'

কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই প্রশান্ত গেলো পাশের ঘরে ; চশমা চোখে দিয়ে ফিরে এলো একটু পরে। এইবার ফুটেছে তার স্বরূপ। সে যা, তাকে ঠিক তা-ই দেখাচ্ছে ঝকঝকে সোনার পাৎলা চশমায় : সজীব, সবুদ্ধি, সক্রিয়—উদ্যোগের অভাব নেই, হারতে হ'লে হারতে জানে ; চপল নয়, কিন্তু পাৎলা ঠোঁটের কোন দিয়ে ফস্ ক'রে একটা তেতো ঠাট্টাই বেরিয়ে যেতে পারে।

বরুণা বললে : 'আঁখি আর পাখি। আর কাকে বলবে ?'

'সোমনাথ ?'

'সোমনাথবাবুর কি খুব ভালো লাগবে এই—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রশান্ত বললে : 'বাঃ, সোমনাথকে তো বলবেই।'

বরুণা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।—'তাঁর হয়-তো খুব ভালো লাগবে না, এই কথাই ভাবছিলাম।'

'এই পারিবারিক সম্মেলনে সোমনাথকে হাতের কাছে না-পেলে তো বাঁচবোই না।' প্রশান্ত মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। 'তা ছাড়া—'

বাঁকা হাসলো বরুণা।

'সুমিতাও আসছে', খুব সহজভাবে সে বললে।

'ওর যন্ত্রণা হবে, কিন্তু তাই ওর ভালো লাগবে। বেচারা।'

'সুমিতার সঙ্গে বিয়ে যখন হয়নি, তখন আর বেচারা বলছো

কেন? কিন্তু তোমার বন্ধু এখনো মনে-মনে আশ্চর্যরকম দুর্বল।'

'হুঁ। এবার খেতে বসি।'

ফাউণ্টেন পেনের ক্যাপটা আটকে রেখে বরুণা উঠে দাঁড়ালো। 'ডিস্‌ইল্যুশন-প্রুফ', খাবার ঘরে যেতে-যেতে বললে।

টেবিল আছে সাজানো, প্রশান্ত বসলো। খেতে আরম্ভ করবার আগে এক ঢোঁক জল খেয়ে নিলে। 'তুমি বসবে না?'

'আমি একটু পরে খাবো। কী-কী আনতে হবে তার ফর্দ করছিলাম।'

'আইডিয়ল', হঠাৎ প্রশান্ত বললে। 'পেত্রার্কের লরা বিয়ে করেছিলেন—পেত্রার্ককে নয় অবিশ্যি—বহু পুত্রকন্যা জন্মেছিলো। কল্পনার পাতা গজাবার একটা ডাল আর কি। সোমনাথের কথা বলছি।'

বরুণা বললে, 'একজন মিসেস দান্তেও ছিলেন শোনা যায়। অপত্যাদিও অল্প ছিলো না। বিয়াত্রিচে নেহাৎই কল্পনার গাড়ি চালাবার এঞ্জিন। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'এ-বিষয়ে সোমনাথবাবু দান্তের মতো হ'লেই খুসি হতাম।'

'সোমনাথের বিয়ে দিতে তুমি যেন বড্ড ব্যস্ত।'

'বিয়ে ওঁর করা উচিত। তবে আমি এটা দেখেছি যে তিরিশের মধ্যে বিয়ে ক'রে না-ফেললে পরে আর সহজে হ'য়ে ওঠে না।'

'মাছের ভাজা দুটো চমৎকার হয়েছে।'

'মল্লিকাদেরও বলবে তো ?'

'বলেছি। কুঙ্কুম কাল এসেছিলো আমার আপিসে বেশ ছেলে।'

'তোমার মামা এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারতেন।'

'নিজেদের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে, রুনি ?'

বরুণা চুপ ক'রে রইলো।

'কুঙ্কুম কাল এসে এটা-ওটা নানা কথা ব'লে চ'লে গেলো। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আসল কথাটাই বলতে পারলে না।'

'যদি বুঝতেই পারলে তাহ'লে বলতে না হয় না-ই পেরেছে।'

'পারা উচিত। অত ভারি জিভ হ'লে এ-পৃথিবীতে কি কিছু হয় !'

'এ-পৃথিবীতে তুমি আছো, সুখের কথা।'

প্রশান্ত আস্তে একটু হাসলো।—'কিন্তু এতটা কি আশা করা উচিত ? আমাকে বলতে হবে, তবে তো।'

'আমার তো মনে হয় কুঙ্কুম কিছুই আশা করছে না।'

'হুঁ। বীরসিং, জল।'

'ছাখো, আমাদের নতুন একটা চায়ের সেট দরকার।'

'আজকের জন্যে ?'

'আজ হ'লেই ভালো হয়।'

'বেশ তো। সেদিন প্রসাদদাসের ওখানে সুন্দর কতগুলো দেখছিলাম।'

'আমি ভাবছিলাম সিগারেটের টিকিট দিয়ে একটা আনলেই হয়। অনেক তো জমেছে।'

'তোমার যদি পছন্দ হয়। কুঙ্কুমকে একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতেই বলি।'

'কিছু আছে নাকি?'

'হবে একটা। আমিই হওয়াচ্ছি। অমন একটা চমৎকার মামাতো বোনের জন্যে কিছু করতে হয়।'

'কুঙ্কুম যোগ্যও বটে।'

'সে-কথা ব'লে লাভ কী? অমন যোগ্য কত ছেলেই তো আছে। তার সব চেয়ে বড়ো যোগ্যতা এই যে সে আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করেছে। মনের জোর আছে মেয়েটার।'

প্রশান্ত খাওয়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ মুচকি হেসে বললে: 'জানো, হিউজকে বলেছি। ঠিক হ'য়েই আছে। আগে কিছু বোলো না কিন্তু।'

বরুণা বললে, 'শুনে খুব শান্তি পাচ্ছি মনে।'

সে ফিরে এলো বসবার ঘরে, আবার বসলো তার ফর্দ নিয়ে। গোটা তিরিশ লাগবে সব সুদ্ধ—চায়ের সেট সিগারেটের টিকিট দিয়েই আনবে, যদি পছন্দ হয়। পঞ্চাশ টাকাই তুলবে। দুপুর বেলায় বেরোবে—প্রথমে ব্যাঙ্ক, তারপর···। তার নিজের সেভিংস্ অ্যাকাউন্টে কত আছে? গেলো তিনমাসের মধ্যে একখানা ছবিও সে চালাতে পারেনি। সম্পাদকরা 'দুঃখিত' হয়েছেন। যদি কোনো 'পৌরাণিক' ছবি ওঁর থাকে, অজন্তা ধরণে। অজন্তা

আজকালকার পাসপোর্ট: যে-কোনো জিনিস চলে। কিন্তু তার হাতে ওটা একেবারেই আসে না। সে একটা দুটো গাছ আঁকতে পারে, আঁকতে পারে কলকাতার রাস্তায় আলো-ছায়ার খেলা। সখ ক'রেই ছবি আঁকা ধরেছিলো ছেলেবেলায়। নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষা পায়নি। একেবারেই মরচে প'ড়ে গিয়েছিলো মাঝখানে; প্রশান্তর সঙ্গে বিয়ের পরে ঝালিয়ে নিয়েছিলো। আর্টের চর্চা হিসেবে নয়, টাকা রোজগারের রাস্তা হিসেবে। সে-সময়টা তাদের বড় কোন-ঠাসা গেছে, এবং এ ছাড়া আর কোনো উপায় তার ছিলো না যাতে স্বামীর একটু সাহায্য হয়। এখন দিন ফিরেছে, বরুণার অভ্যেস ফেরেনি। কিন্তু ছবি থেকে তার রোজগার অবিশ্যি সামান্যই হয়েছে…এ-পর্যন্ত। মন খারাপ লাগে এক-এক সময়। ধৈর্য আর পরিশ্রম তো কম লাগে না, আর তার বদলে কিনা কিছুই নয়। অনেকদিন থেকেই ভাবছে অন্য দিকে মন দেবে। বিজ্ঞাপনের ছবি, পোস্টর, খুচরো কারুকলা। ওতে পয়সা আছে। ব্যাপারটা শিখতে হবে।

বরুণা তার চেক-বই বার ক'রে পাতাগুলো উল্টিয়ে গেলো। একটু হিসেব করলে মনে-মনে। পঞ্চাশটাকার বেশিই বোধ হয় আছে। একটা সেল্ফ্ চেক লিখে সে তার টানা সরু হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলো। আপিসের রাজবেশে প্রশান্ত ঢুকলো ঘরে। গলা উঁচু ক'রে নেকটাইয়ে একটা মৃদু টান দিয়ে বললে, 'চললুম।'

বরুণা ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এলো।

'খেতে বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

'না। আমি এক্ষুনি খেয়ে-দেয়েই বেরুবো।'

'Trusty dusky vivid true!' প্রশান্ত স্ত্রীর গালে দ্রুত ও লঘু একটা চুম্বন দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

সকালবেলাটা ছোট্ট। সুরু হ'লো লম্বা দিন, এমন চুপচাপ, একটা নিঃশ্বাস পড়ে না। বাবলিও আজকাল ইস্কুলে যায়। প্রশান্তর ইচ্ছে ছিলো না এত ছোটোতেই ভর্তি করে। বরুণা জোর করেছিলো। একা বাড়িতে সারাটা দিন, এটা ভালো নয়, মন স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না। বড়ো বেশি ব্যক্তিত্ব, মনের কোনগুলো উঠতে বসতে ফুটে বেরোয়।···কিন্তু তাতেই বা দোষ কী? দোষ, সে ঠিক জানে না; তবে তার মনে এ-রকম একটা ধারণা আছে যে ও-রকম চরিত্র হ'লে দুঃখ পায় বেশি। কিন্তু দুঃখই বা পাবে কেন? আর যতই আমরা চেষ্টা করি না এ জীবনে দুঃখ থেকে কে কাকে বাঁচাতে পেরেছে!

বাবলির ইস্কুল আজকাল সকালবেলায়, এখনই ফিরবে। ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে ফেলে যাক্। উঠে গিয়ে সে আঁখিকে টেলিফোন করলে। এখন একটা চিঠি লিখে পাঠালেই হ'য়ে যায়।

'প্রিয় সোমনাথবাবু,

আজ বাবলির জন্মদিন, আপনি বিকেলে চা খেতে আসবেন। ৬টা

বরুণা দত্ত।'

তাড়াতাড়িতে এই দু'লাইন লিখে ভাঁজ ক'রে খামে ভ'রে ডাকলো: 'বীরসিং।'

বীরসিং-এর কালো টুপি পরা মাথা দেখা গেলো দরজার ধারে। 'এই চিঠিটা এক্ষুনি দিয়ে এসো সোমনাথবাবুকে—মহেন্দ্র রোড—বুঝেছো তো?'

বীরসিং মাথা নাড়লে।

বীরসিং চিঠি নিয়ে বেরোবে ব'লে যেই দরজা খুলেছে, ছোট্ট দুটি পা লাফিয়ে ঘরে ঢুকলো। টুকটুকে লাল জুতোর উপর ব্রাউন রঙের নিটোল দুটি পা সোজা উঠে গেছে, হাঁটুর উপরে থেমেছে নীল রঙের ফ্রক। ছোট্ট, ভারি ছোট্ট একটি শরীর সেই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, ভারি সুন্দর। ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথা ভরা।

বাবলির পিছনে ঢুকলো কালো-কালো মোটা রোঁয়াওয়ালা ব্রাউন-মুখো একটা আইরিশ টেরিয়র, আর তারও পিছনে ঢুকলো ঝি।

'মা!'

বাবলি ঝাঁপিয়ে মুখ গুঁজলো বরুণার কোলে। একটু পরেই মুখ তুলে বললে: 'ইস্কুল থেকে বেরিয়েই দিয়েছি দৌড়। ঝি ক—ত পিছনে ছিলো।'

'রাস্তায় অমন ক'রে ছুটতে নেই।'

'কেন, মোটর আছে ব'লে? আমি তো ফুটপাথ দিয়ে চলি।'

বরুণা মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বললে: 'জিমিকে কোথায় পেলি?'

'ওঃ, জানো না? ও তো রোজ ছুটির সময় ইস্কুলের দরজায় ব'সে থাকে।'

'তাই নাকি!'

'বাঃ! রোজ করে এ-রকম। জিম্, জিম্!'

জিমি ঘরে এসেই শুয়ে পড়েছিলো। পা দুটো সামনের দিকে বাড়ানো, চোখা মুখটা ঠেকেছে মেঝেতে, পায়ের ফাঁক দিয়ে কালো চোখ দুটো অসম্ভব চক্‌চক্ করছে।

'জিম্!'

ধুপ ক'রে বাবলি ব'সে পড়লো মেঝেতে, কুকুরটার ঘাড় ধ'রে টানতে-টানতে বললে: 'এই, ওঠ্ না। দেখলে, মা, দেখলে, কী রকম ঘেঁটু! কিছুতেই উঠবে না। ও করে কী জানো মা, আমার অনেক আগে চ'লে যায় তো—একটু থেমে আবার পিছনে তাকায়, আমাকে দেখে নিয়েই দৌড়। তুমি কি ভেবেছো ও এই এলো! কখন এসেছে, এসে আবার ছুটে গেছে, তারপর এই আমরা একসঙ্গে এলাম। এই, জি—ম্!' বাবলি প্রাণপণে টানতে লাগলো কুকুরটার কান ধ'রে।

জিমি তবু একটু নড়লো না; মেঝেতে মুখ দিয়ে প'ড়ে অতি সূক্ষ্ম কূঁ-কূঁ আওয়াজ করতে লাগলো।

'কী ঘেঁটু দেখলে, কিছুতেই উঠবে না এখন! ছাখো, মা, ছাখো, কেমন শূলকি মুখ করেছে।'

'শূলকি কাকে বলে রে?'

'বাঃ, শূলকিই তো! ছাখো—ছাখো না! জিমির গায়ে ওরা

কেউ হাত দেয় না, মা—বলে, কামড়াবে। আমি বলি—দূর! জিমি কক্ষনো—'

কিন্তু কথাটা শেষ না-হ'তেই এত কথার যে উপলক্ষ্য সে ঘোঁৎ ক'রে এক ডাক ছেড়ে তীরের মত ছুটে চ'লে গেলো পাশের খাবার ঘরে। হাত-তালি দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো বাবলি। 'বেড়াল! বেড়াল দেখলেই হ'লো। মা, এর পর জিমির জন্মদিন করবো।'

'জিমির জন্মদিন কবে তা তো জানিনে।'

'আমার জন্মদিন তো জানো। কে ব'লে দিলে মা?'

কিন্তু কথাটার উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রেই বাবলি মেঝে থেকে উঠে বরুণার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাজে কাগজের ঝুড়িতে কী-একটা জিনিস চকচক করছে, বড় লোভ হ'লো সেটা তুলে আনে, সামলে গেলো। আজ তার জন্মদিন। সকাল থেকে এক মুহূর্ত্তও কথাটা সে ভুলে থাকতে পারেনি। এ-দিন অন্য সব দিনের চাইতে আলাদা। সবই আলাদা এ-দিনে। ঠিক আরাম লাগে না, সত্যি বলতে; ইচ্ছে-মত সব করা যায় না। এ-দিনের সঙ্গে মানিয়েই চলতে হয়। সেজে থাকতে হয়। তবু…বাবলির পক্ষে এই একটি দিন অতি আশ্চর্য, প্রায় অলৌকিক। কতদিন থেকে সে আশায় ব'সে আছে—এই দিনটি আসবে ব'লে। শুনতে পায় এর আগেও তার জন্মদিন এসেছে, সে-সব তার ভালো মনে নেই। বলতে গেলে এই তার জীবনের প্রথম জন্মদিন। ভাবতে-ভাবতে সে কোনো কূল পায়নি, কত-কিছু

ভেবেছে। এলো সেই দিন—তেমন আশ্চর্য কিছু ঘটলো না, সে হঠাৎ মা-র মত বড়ো হ'য়ে গেলো না, কি আকাশে পাখা মেলে উড়লো না—সকালে উঠে তেমনি ইস্কুলে গেলো, জিমির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে বাড়ি ফিরলো। কিন্তু এখনো তো সময় আছে, হয়-তো দুপুরে, সে যখন একা চুপচাপ ব'সে-ব'সে খেলা করবে—কি সন্ধেবেলা যখন সবাই আসবে···। সন্ধে হ'লেই তো দিন ফুরিয়ে গেলো কিন্তু আজ যেন অনেক দেরি ক'রে সন্ধে হয়,—অনেক দেরি ক'রে।

'বাবলি, চলো এবার স্নান ক'রে খাবে।'

২

পত্রবাহক বীরসিং-এর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে সোমনাথের পথেই দেখা। এক মিনিট আগে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এক হাতে ঝুলছে চামড়ার বাক্স, অন্য হাতে ধরেছে ছাতা। কোঁচাটা গুঁজেছে পকেটে, নয় তো হাঁটাই অসম্ভব। খেয়ে উঠে একটা সিগারেটও ধরাতে পারেনি। ঠোঁটের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু হাত দিয়ে না-ধ'রে সিগারেট খেতে সে পারে না। অনেকে পারে, সে পারে না। চোখে ধোঁয়া যায়, ঠোঁটে তাপ লাগে, দম আটকে আসে। ও-চেষ্টা না-করাই ভালো। বাস্ পর্য্যন্ত আগে পৌঁছনো যাক্। রাস্তা নেহাৎ কম নয়, হাঁটছে প্রাণপণে, না-দৌড়িয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। মোটে সময় নেই। গেলো বুঝি আজও

দেরি হ'য়ে। হে ঈশ্বর! রোজই সে সঙ্কল্প করে, হাতে অন্তত দশ মিনিট সময় রেখে বেরোবে; আয়োজন আরম্ভ করে ঠিক সময়েই। দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া নাম-মাত্র···কিন্তু তবু, তার পরেও শেষ মুহূর্তে উন্মত্ত তাড়াহুড়ো লেগেই যায়। হয় জামায় বোতাম নেই, নয় রুমাল নয় সিগারেট-কেস নয় কলম খুঁজে পাচ্ছে না···হয় একটা, নয় আর-একটা। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা সেই অতি সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল অপরিসরে এসে ঠেকবেই। কোনোদিন হয়-তো বিজয়ী বীরের মতো বেশ সময় হাতে রেখে ধীরে-সুস্থে বেরুলো, সেদিন ঘড়িটা নিশ্চিত প্রতারণা করবে—কখন্ এক ফাঁকে সে পনেরো মিনিট ঢিমে হ'য়ে ব'সে আছে! ঈশ্বর! ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে কী ক'রে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায়! অথচ সে ছাড়া সবাই তো অনায়াসে পৌঁছয়—অন্তত তা-ই মনে হয়। আর এই ব্যাপারটাই তার মনে হয় সব চেয়ে দুরূহ—দশ বছরের অভ্যেসেও শোধরালো না। রোজ এই ঊর্দ্ধশ্বাস তাড়াহুড়ো, রোজ; ঘামতে-ঘামতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে পৌঁছনো। তবু ভালো—দেরি না-হ'লেই হয়। কেবল গিয়ে পৌঁছতেই যা পরিশ্রম···

বীরসিং পথ আগ্‌লে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

'চিঠি।'

'ও, চিঠি।' দ্রুত অগ্রসরণে বাধা পেয়ে সোমনাথ থমকে থমত খেয়ে দাঁড়ালো। 'চিঠি—কার?'

'আপনার।'

'ও, হ্যাঁ।' সোমনাথ তার অ্যাটাশে-কেস সুদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিলে। দু' আঙুলে নিলে চিঠিটা। 'আচ্ছা।'

বীরসিং একটু ইতস্তত করলে।

'একটু ধরো তো এটা।'

বীরসিং-এর হাতে ডান হাতের বোঝাটা বদলি ক'রে ছাতার ডাঁটটা চেপে ধ'রে সে চিঠি খুললো। চিঠি প'ড়ে পকেটে ভ'রে রেখে বললে: 'আচ্ছা।'

এই বুঝি গেলো দেরি হ'য়ে। বাস্-এর রাস্তাও কি ছাই কম দূর! বাক্সটা নেবার জন্যে আবার হাত বাড়াতে বীরসিং বললে: 'আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না, দরকার নেই।'

'চলুন, আমি তো ওদিকেই যাবো।'

পরিষ্কার বাঙলা বলতে শিখেছে নেপালিটা। ভদ্র চাকর, ভদ্রলোকের উপযুক্ত। বীরসিং ফোলা-ফোলা পাজামা-পরা সুগঠিত পা ফেলে অনায়াসে যাচ্ছে, সোমনাথ চলেছে ধুতির ঝুল সামলে প্রাণপণে হাঁপিয়ে। ঐ বড়ো রাস্তা। ট্র্যাম চলেছে। প্রাণের মায়া না-ক'রে রাস্তা পার হওয়া—এসে পড়েছে তার বাস্। শেষের কয়েক গজ দৌড়েই পার হ'লো—হয়-তো ঐ ট্র্যামটায় আটকা পড়তো! দৌড়টা সুদৃশ্য হ'লো না নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় নেই। বাস্ এসে থামবার সঙ্গে-সঙ্গে সে'ও পৌঁছলো। চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে। সে গেলো ছুটে হাতল ধ'রে উঠতে,

মোটা একজন লোক তক্ষুনি নামছে। মোটা লোকটি নামলো, একে-একে চারজন লোক লাফিয়ে উঠলো গাড়িতে; প্রতিবার সে চেষ্টা করতে গিয়ে পেছিয়ে এলো। সারভাইভল অব দি ফিটেস্ট। তারপর গাড়িটা তাকে না নিয়েই প্রায় দৌড় দিয়েছিলো, মরীয়া হ'য়ে সে উঠলো পা-দানিতে হাতল আঁকড়ে, কণ্ডক্টরের দুর্গন্ধি জামায় নাক ঠেকিয়ে।

'বাবু! বাবু!'

নিলে টেনে বীরসিং-এর হাত থেকে চামড়ার বাক্সটা। কব্জি দুটো ভালো নেই—ভাগ্যিস টানা-হেঁচড়ায় খুলে যায়নি। হঠাৎ হাঁ হ'য়ে বইগুলো রাস্তায় গড়িয়ে পড়লেই হয়েছিলো।

কণ্ডক্টরের সাহায্যে ছাতা ও বাক্স সমেত সে চালান হ'লো পা-দানি থেকে গাড়ির মধ্যে। এক ধাপ উপরে উন্নতি হ'লো বটে, কিন্তু ঠিক স্বর্গসুখ অনুভূত হ'লো না। গাড়িতে এক তিল জায়গা নেই। মাথার উপরকার লম্বা পিতলের হাতল ধ'রে দশ-বারোজন দাঁড়িয়ে। গরম, ঘাম, বদগন্ধ, নিঃশ্বাস নেয়া যায় না। কিন্তু পৌঁছতেই হবে; যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছতেই হবে। এখানে সকলেরই সেই অবস্থা। অতি কষ্টে সে সামনের দিকে একটুখানি জায়গা ক'রে নিলে, এক হাতে ধরলে বাক্সটা, সেই হাতেই কনুইয়ের ভাঁজে ঝুলিয়ে দিলে ছাতা, অন্য হাতে ধরলো হাতল! স্ট্রগ্ল্ ফর এগ্‌জিস্‌টেন্স্।

বাস্ চলেছে মসৃণ অবাধ গতিতে চৌরঙ্গি দিয়ে। এমনি যেতে

হবে এসপ্লানেড পর্য্যন্ত, খেয়ে উঠে এ-পর্যন্ত একটা সিগারেট ধরাতে পারলে না। বরুণার হাতের লেখাটি বেশ। সত্যিকারের মহিলা: নিজের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, আত্মনির্ভর। সঞ্চরিণী পল্লবিণী লতা নয়, বরঞ্চ কোনো গর্বিত বৃন্ত, ক্ষীণ, ঋজু, শক্ত; ফুল-ফোটানো। বরুণা দত্ত কেবল যে নিজে ফোটে তা নয়, অন্যকেও ফুটতে সাহায্য করে। তার সংসর্গ আত্ম-বিশ্বাসে প্রেরণা দেয়। আর যেহেতু ঈশ্বর সোমনাথকে আত্ম-বিশ্বাস মোটে দেননি, বরুণা সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সে শ্রদ্ধাবান। ভালো লেগেছে তাকে প্রথম থেকেই, অবাক হয়েছে দেখে, প্রতিদিন আরো বেশি অবাক হচ্ছে। কোনো রকম হৈ-চৈ না-ক'রে অনায়াসে কত কাজ সে ক'রে যায়, নিঃশব্দে। কেউ কিছু টের পায় না। হাতে তার সর্বদাই যথেষ্ট সময়; প্রচুর গল্প আড্ডা হাসিখুসির জোগান দেয় অক্লেশে, কোনো কাজও প'ড়ে থাকে না। আশ্চর্য। সোমনাথ কল্পনা করতে পারে বরুণাকে যদি কোনো কলেজে পড়াতে হ'তো, সে শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় প্রতিদিন ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ধীরে-সুস্থে এসে পৌঁছতো—আর তার জন্যে কোনোরকম চেষ্টাই তাকে করতে হ'তো না। আশ্চর্য।

লম্বা শিখ কণ্ডক্টর টিকিট নিচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্যে যে ভাবে সে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত পাতছে, বাহবা দিতে হয়। পয়সা লেন-দেনের একটা ঝঙ্কৃত ঢেউ খেলে যাচ্ছে; চুপচাপ যারা দাঁড়িয়ে, অদৃষ্টের মতো গম্ভীর মুখ ক'রে, তাদের মধ্যে

লাগলো নড়াচড়া। কেমন ক'রে যে সে তার প্রাক্তন স্থান থেকে স'রে এলো, সোমনাথ বুঝতেও পারলে না। সে ছিলো দরজাটার কাছে, তবু একটু ফাঁকা ; এখন মনুষ্যমাংসে ঘেরাও করা ছোট্ট গর্তে সে বন্দী। একদিকে নাকে আসছে সস্তা দিশি তেলের কড়া গন্ধ, অন্য দিক থেকে বিড়ির ভারি আবিল ধোঁয়া। ভাগ্যিস বেরোবার সময় কিছুই প্রায় খাওয়া হয় না : পেট ভ'রে খেলে নিশ্চয়ই বমি হ'য়ে যেতো। নাকে রুমাল চাপবার উপায় নেই। ঈশ্বর মানুষকে দুটো হাতই কেবল দিয়েছিলেন : তাকে যে কোনোকালে কলকাতায় দশটার সময় বাস্‌-এ চ'ড়ে কর্মস্থলে যেতে হবে, এতটা দূরদৃষ্টি তাঁর হয়নি। ঐ গর্তে পা রেখেও ছাতা আর চামড়ার বাক্স ঠিক ব্যালেন্স্‌ করতে হচ্ছে। এই কসরৎখানা চার্লি চ্যাপলিনের নেহাৎ অযোগ্য নয়, মনে-মনে ভাবলে সোমনাথ।

কণ্ডক্টরের মস্ত নোঙরা হাত ঐ মনুষ্যদেয়াল ভেদ ক'রে প্রসারিত হ'লো তার দিকে। 'টিকিট স্তার।' সোমনাথ বুদ্ধের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যা-ই বলো না, চতুর্ভুজ তো আর নই। 'আপ্‌কা টিকিট!' ওঃ, টিকিট দিতেই হবে, না? দেখতে পাচ্ছো না কত টায়ে-টুয়ে দাঁড়িয়ে আছি! খুব এক চোট ধমক দিলে ঠিক হয়—অনেকদূরে যাবো, পালিয়ে যাবো না। চমৎকার লাগসই কতগুলো কথা তার মনে খেলে গেলো—বুরবক্‌ ইডিয়ট, বেয়কুফ্‌...কিন্তু ততক্ষণে হাতলের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে সে পকেট থেকে পয়সা বার করছে। এ-কসরৎটা চার্লি

চ্যাপলিনের অধিকতর যোগ্য : এবং সত্যি বলতে, নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই প্রায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। টলতে-টলতে সে পাশের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট এক মহিলার কোলে প্রায় ঢ'লে পড়েছিলো, কিন্তু পড়লো না; হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কপাল চমৎকারভাবে ঠুকে গিয়েছিলো প্রায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলো না। কণ্ডক্টরের হাত থেকে টিকিট নিয়ে, খুচরো পয়সা নিয়ে ও সেটা পকেটে ভ'রে সে যখন আবার প্রাকৃত অবস্থায় দাঁড়ালো, তখন এতেই তার অবাক লাগলো যে সঙ্গে-সঙ্গে বাস্-এর সব লোক হাত-তালি দিয়ে উঠলো না।

বাস্টা হঠাৎ থামলো। পার্ক স্ট্রিট বুঝি। তাকিয়ে দেখবার উপায় নেই, চোখের রাস্তাগুলো সবই বন্ধ। শুধু বোঝা যায় বাস্-এর গতি আর ঝাঁকুনি—শেষেরটা হাড়ে-হাড়েই বোঝা যায়। শরীরটাকে নানা কায়দায় মুচড়ে-মুচড়ে দু'জন নেমে গেলো। অন্য দু'জন বসলো। তার পালা আসতে দেরি আছে এখনো। বসবার জন্যে সে বেশি ব্যাকুলও নয় আর। বাস্টা ফুর্তিসে চলুক তো, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলেই হয়। ঘড়ি যা বলছে তাতে তো মনে হয় পারবে, কিন্তু ঘড়ির বিশ্বাস কী! একটু পরে গাড়িটাই যে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করবে না তা-ই বা কে জানে। যে-ক'জন যাচ্ছে, সকলেরই মনে ঐ কথা : পৌঁছতে পারলেই হয়। সকলেরই মুখ বুদ্ধের মতো, নিয়তির মতো গম্ভীর। কারো মুখে একটা কথা নেই। কেবল একটা লক্ষ্যের উপর

সমস্ত মন তাদের নিবদ্ধ : যেতে তাদের হবেই, পৌঁছতে তাদের হবেই। উপজীবিকা।

শেষ হবে…কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যাবে, এমনি আর-একটা বাস্-এ ক'রে সে ফিরবে, দিনের ঋণ শোধ ক'রে। এই যাবার মুখে সেটা যেন বিশ্বাসই হয় না। বাড়ি আবার, তার ঘর আবার ; আবার তার নিজের জীবন। তার রাজত্ব। যাতে সেই রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে সেইজন্যেই তাকে যেতে হচ্ছে এই বাস্-এ চ'ড়ে…কিন্তু কী বৈসাদৃশ্য ! সন্ধেবেলায় যে-লোক স্নানান্ত প্রসন্নতায় সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে বসে পাখার নিচে, পড়ে কবিতার বই, করে কাব্য দর্শন জীবন সম্বন্ধে বিদ্যুৎ-ঝলসানো আলোচনা—এ কি কখনো ভাবা যায় যে দশটা বেজে সাত মিনিটে সে-ই দৌড়িয়ে রাস্তা পার হ'য়ে তাড়াতাড়ি বাস্-এ উঠেছিলো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শেক্‌স্‌পিয়র পড়তে-পড়তে যার বিস্ময়ের কূল থাকে না, সে-ই কিনা দশটা সতেরো মিনিটে ভারগ্রস্ত বিপর্যস্ত হ'য়ে ভিড়ের ঠেসাঠেসিতে বাস্-এ দাঁড়িয়ে চলেছে। এগুলোই হচ্ছে আধুনিক জীবনের অসঙ্গতি। বর্ত্তমান পৃথিবী একজনকে সবই দিতে প্রস্তুত, শিক্ষা সংস্কৃতি সুরুচি, উচ্চতম উপভোগের ক্ষমতা ; শুধু যথেষ্ট টাকাই হয়-তো দিলে না যাতে জীবনে সেই সুরুচির মর্যাদা রক্ষা হয়, যাতে উচ্চতম উপভোগের উপকরণ অধিগম্য হ'তে পারে। সত্যি আমার একটা গাড়ি থাকা উচিত, সোমনাথ ভাবলে

পরিক্রমা

বিজন ঘোষের ঘুটো আছে। ইচ্ছে করলেই আরো ঘুটো কিনতে পারে। পৃথিবীতে বিজন ঘোষদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, যে-সব গাড়ির তারা মালিক, তার সংখ্যা আরো বেশি। বিজন ঘোষের মনটা দাড়িওয়ালা কচুর মত স্থূল ও কর্কশ; শিক্ষা তার কিছু নেই, রুচি তার বীভৎস; এমন কি সাধারণরকম ভদ্র ভালোমানুষও সে নয়। তার সঙ্গে কথা বলা যায় না, এবং চুপ ক'রে থাকার অনুগ্রহও সে কখনো করবে না। তাকে এড়াবার জন্য আস্ত একটা ক্রস্‌কন্ট্রি-রেস দৌড়নো যায়; ছাদ থেকে লাফানো আর নদীর জলে ঝাঁপানো ছাড়া এমন কিছু নেই যা করা না যায়।

পৌঁছলো এস্‌প্লানেড। অনেকে নেমে গেলো। মোটা একটা লোক, বস্তার মত, ঘাড় নেই, বসেছে হাঁটু ছড়িয়ে; ঈশ্বরের দয়ায় তারই পাশে সোমনাথের জায়গা হ'লো। সঙ্কুচিত হ'য়ে বসলো কোনোরকমে, স'রে বসতে বললে না, ব'লে কিছু লাভ নেই। বাস্‌-এ ট্র্যামে সব সময়ই তাকে মোটা লোকের পাশে ব'সে বসতে হয়, এটা তার নিয়তি। এতক্ষণে সে ধরালে একটা সিগারেট, আঃ! এই তার প্রতি দিনের পথ, গির্জে আর দোকান, বাজার আর বাড়ি, যান আর ধুলো আর গোলমাল, আর অমৃতস্য পুত্রকন্যাদের ভিড়। সে-ও এই স্রোতের, সে যাচ্ছে তার কাজে। তার কাজ রোজ দু' তিন ঘণ্টা এক সমবেত যুবমণ্ডলীর কাছে চ্যাচানো। সে চ্যাচায়···হয়-তো যথেষ্ট চ্যাচাতে পারে না। দশ বছর সে এ-ই করছে। আর এ-ই কি তাকে করতে হবে,

যতদিন সে বেঁচে আছে, রোজ, বছরের পর বছর বিভিন্ন যুব-সমবায়ের কাছে একই জিনিস একই ভাবে চীৎকার করা? যেদিন সে তা না-করবে সেদিনই তার বাঁচবার উপায় থাকবে না? এ না-করলে বাঁচবার অধিকারই তার নেই?…তবু ভাগ্যিস ছুটিগুলো আছে, সোমনাথ ভাবলে।

ভাগ্যিস আছে। এই তো কাছে এলো গ্রীষ্মের ছুটি: দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন, অফুরন্ত, অপর্যাপ্ত সময়। মুক্ত হবে সে কিছুদিনের মতো: খাওয়া যখন খুসি, গল্প যখন খুসি, যত ঘণ্টা যত মিনিট সময় আছে যত শেষ যদি হয় চিরকালের মতো! চিরকালের মতো না হোক্, আপাতত শেষ হবে। শেষ ক'রে দেবে সে সময়ের অত্যাচার, ঘড়ির নিষ্ঠুরতা—যে-কাঁটা আমাদের হৃৎপিণ্ডে সব চেয়ে নির্মম হ'য়ে বিঁধে আছে, উপড়ে ফেলে দেবে সেই ঘড়ির কাঁটাকে। কী করবে সে এই ছুটিতে? দাড়ি রাখবে? বয়েস হ'লো ঠিক চৌত্রিশ, নেহাৎ বেমানান হয়-তো হবে না এখন। সদ্য-কামানো মসৃণ গালের উপর একবার হাত বুলোলো। কেমন দেখাবে তাকে দাড়ি রাখলে? কবির মতো? দস্যুর মতো? পাদ্রির মতো? মুখটা তার পাৎলা, নাকটা চোখা—হয়-তো একটু মেফিস্টোফিলিয়ান দেখাবে। সে হলদে রঙের কাগজ কিনবে আর বেগনি রঙের কালি কিনবে তারপর একটা বই লিখবে। বইটা ছাপাবে গোল-গোল পাতায়, পার্চমেণ্ট কাগজে সেপিয়া রঙে। এখন বইটা কী হবে সেটা ভাবতে পারলেই হয়। তিরিশের মাঝামাঝি হ'লো, এবার আত্মচরিত লেখা যায়।

বইয়ের নাম দেবে ব্রে। ব্রে: মানে চীৎকার, আত্ম-ঘোষণা, তাসখেলায় হেরে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে হারস্বীকার। গাধার ডাক ডাকবে সে, সেপিয়া রঙে ছাপা গোল-গোল পাতায়। তাসখেলায় হার হয়েছে, জিৎ হয়েছে বিজন ঘোষের। আজ সে অনায়াসে এ-সব কথা ভাবতে পারে, নিজের মনের সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলতে হয় না। দগদগে ঘা শুকিয়েছে। ঘা লেগেছিলো… হ্যাঁ, লেগেছিলো বইকি। প্রায় ম'রে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াবে, যাবে অনেকদূরে, যেখানে দিনরাত্রির নীল নদীতে ঢেউ উঠছে আর ছায়া দুলছে। ভাগ্যিস যায়নি। আবার তো আসতে হ'তো চাকরি খুঁজতে: সে তো ম'রে যেতো না, তাকে তো খেতে হ'তো। রূপসী যুবতী জিল্ট করেছে তাকে সেটা দুঃখের বটে, কিন্তু আজকালকার দিনে চাকরি খুঁজতে হওয়ার তুলনায় কিছুই নয় সেটা।

সোমনাথ মনে-মনে হাসলো। কী সহজে সে এখন ভাবছে এ-সব কথা: হয়-তো আলোচনাও করতে পারে—প্রশান্ত…কি বরুণার সঙ্গে। মনে-মনে সে ছবি দেখলো বরুণার শান্ত-ব্রাউন চোখ তার উপর নিবদ্ধ, আর সে একটু-একটু ক'রে আস্তে-আস্তে ব'লে যাচ্ছে। এতদিনে বলতো হয়-তো: যদি সেটা নিজেরই মনে না-হ'তো অনুকম্পার জন্য আতুর হাত বাড়ানো। এখন আর তার অনুকম্পার দরকার নেই। ভেবেছিলো কখনো

ভুলবে না, ভুলেছে তো। সাত বছর হ'লো। দু' জোড়া পিকানিনি এসেছে। আছে ভালো। সে, সোমনাথ, সে-ও তো বেশ আছে। গড্স্ ইন্ হিজ হেভন, অল্স্ রাইট উইথ দি ওয়ার্লড: মাঝখান থেকে অকারণে খানিকটা কাটাছেঁড়া টানা-হেঁচড়া। কোনো দরকার ছিলো না, সোমনাথ ভাবলে। গ্রীষ্মের লম্বা দুপুরে ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন। সকলের জীবনেই একবার মিড্সামার আসে, তারও এসেছিলো। O Bottom, thou art translated! সে গাধা ব'নে গিয়েছিলো, গাধা ব'নে পরম খুসি হয়েছিলো। তবু...তবু...বিজন ঘোষকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কখনো ভাবতেও পারেনি সে, মানুষ ব'লেই ভাবতে পারেনি। এখনো পারে না। এ অতি সরল সহজ কথা: এতে ঈর্ষা নেই। বিজন ঘোষকে ঈর্ষা করবে এত দীন কখনোই নয় সে। স্থূল, কর্কশ, মূর্খ, ড্যাবডেবে স্যাঁৎসেঁতে কোলাব্যাঙ। বিজন ঘোষকে বর্ণনা করবার এ ছাড়া কথা নেই। এগুলোই হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক মাপজোক; যেমন কিনা দরজি বিজন ঘোষের গলার মাপ নিয়ে বলে, ছাব্বিশ ইঞ্চি। ছাব্বিশ ইঞ্চি গলা শুনতে ভালো নয়; কিন্তু তাতে দরজির ঈর্ষা কি বিদ্বেষ সূচিত হয় না।

•

মোটা লোকটা নেমে গেলো, এতক্ষণে সোমনাথ সত্যি একটু আরাম ক'রে বসলো। এটুকু সুখ ক'রে আর কী হবে, এসেই

গেছে প্রায়। এখনই কী রোদ, তাকানো যায় না। আজ বরুণাদের ওখানে হয়-তো দেখা হবে ওদের সঙ্গে। সে কী করবে···প্রশান্তর আত্মীয়দের মধ্যে ব'সে? ভাগ্যিস বাড়িতে একটা কুকুর আছে। বাবলিও আছে···তা বাবলি তো আজ বড্ড ব্যস্ত। একটা উপহার কিনতে হবে: কী কেনা যায়? সত্যি, সুস্মিতার সঙ্গে দেখাশোনা আর না-হ'লেই যেন ভালো। আশ্চর্য, এখনো তার মন এটুকু কাঁচা আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কলকাতা মস্ত জায়গা। কেবল প্রশান্তর বাড়িতেই মাঝে-মাঝে···। শেষ দেখা হয় মাস দু'য়েক আগে। এখনো তেমনি সুন্দর আছে। না, দিন-দিন আরো সুন্দর হচ্ছে। দশ বছর আগে তার ষোলো বছর বয়েস ছিলো, যাকে বলে রূপ! এখন ছাব্বিশ। কে বলবে!—প্রতি বছর যেন তার একবছর ক'রে বয়েস কমছে। ঐ চোখ, ঐ চুল, ঐ অনির্বচনীয় আঙুল! কিন্তু সে যাকে বেছে নিলে সে বিজন ঘোষ। প্রকাশ পেলো মনটা। ঐ তার আশ্চর্য শরীর, আর ঐ তার তুচ্ছ মন! ঐ চোখ আর চুল আর ঐ অনির্বচনীয় আঙুলের সঙ্গে ঈশ্বর তার ভিতরেও কিছু দিতেন যদি! এত আয়োজন এত সাজসজ্জা ব্যর্থ হ'য়ে গেলো সেই অন্য-কিছুর অভাবে। ব্যর্থ আমি বলছি, সোমনাথ ভাবলে, এবং আমি জানি আমি ঠিকই বলছি। কিন্তু পৃথিবীর লোকের সামনে এ-কথা আমি বলবো না। আমার হার হয়েছে। হার যার হয় সে-ই গাধা। আমি গাধা বনেছিলাম, এবারে গাধার ডাক ছাড়বো। ব্রে। লিখতে হবে বইটা।

পরিক্রমা

কলকাতার বাস্-এর পক্ষেও অসাধারণ একটা ঝাঁকুনিতে বিনা চেষ্টায় শূন্যে উত্থিত হ'লো তার পশ্চাদ্দেশ। আরে, এসে পড়েছে যে। ছাতা আর বাক্স সংগ্রহ ক'রে নিয়ে নামলো সে, ছাতা খুলে পা চালালো দ্রুত। আজকাল আর সে ছাতা হারায় না। এটি তার তিন বছরের। কলেজে পড়বার সময় ছাতা জিনিসটার প্রতি ছিলো তার নিদারুণ অবজ্ঞা। বর্ষা এলে মা কিনে দিতেন জোর ক'রে, নিশ্চিত হারাতো সপ্তাহ না-যেতে। রোদ উঠেছে, বৃষ্টি পড়েছে ; কোনোটাকেই কিছু মনে হয়নি। আর এখন এই এপ্রিল মাসে ছু' মিনিট হাঁটতে হবে ব'লে এত অসুবিধে ক'রেও বহন করছে এই কুৎসিত জিনিসটাকে। এখন আর রোদ সয় না। বৃষ্টিতে ভিজতে কী যে চমৎকার লাগতো সেটা ভুলেই গেছে। বয়েস বাড়ছে। এখন আর লোকে তাকে কলেজের ছাত্র ব'লে ভুল করে না—সেদিনও করতো। আর ছু' দিন পরেই হয়-তো সে ধুতির সঙ্গে মোজা পরতে আরম্ভ করবে, নেহাৎই সময় বদলেছে ব'লে গলা-বন্ধ কোটের উপর চাদর জড়াবে না।

একটা দোকানের ঘড়ি চকিতে তার চোখে পড়লো। সময় আর নেই। যাক্ ; পথও ফুরিয়েছে। এবার মোড়টা ঘুরলেই…। আশ্চর্য, আমিও বুড়ো হ'তে চলেছি, হঠাৎ সোমনাথের মনে

হ'লো। বুড়ো না হোক্, বয়স্ক হয়েছি, বিজ্ঞ হয়েছি, প্রবীণ হ'তে দেরি নেই। বুড়ো হ'তেই বা দেরি কী! সময় কাটে, আমরা সকলেই বুড়ো হই। শুধু সুমিতার বয়েস বছর-বছর কমছে। আশ্চর্য, কী সুন্দর! এই যে নিছক শারীরিক সৌন্দর্য, এর কি কোনো অর্থ নেই, কোনো মূল্য নেই? কী সুন্দর, এখনো দেখলে হঠাৎ ধাক্কা লাগে বুকের মধ্যে, নিঃশ্বাস পড়ে না। এখনো···

ঢঙঢঙ ক'রে বাজলো ঘণ্টা। সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠতে-উঠতে সোমনাথ কপালের ঘাম মুছলো। যাক্, ঠিক সময়েই সে পৌঁচেছে।

৩

টেলিফোন বাজলো।

বরুণা পাউডর-পফ্ রেখে দিলে, এক ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে এলো টেলিফোনের কাছে।

'হ্যালো।'

'বৌদি, একটা কথা বলতে তখন ভুলে গেলাম।'

'ব'লে ফ্যালো।'

'মন দিয়ে শুনবে ব'লো।'

'আঁখি, নির্ভয়েই বলো।'

'কথাটা হচ্ছে—এই পাখি সম্বন্ধে।'

'ও।'

'বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিনে।'

'কথাটা কি এমনি যা বিশেষ উৎসাহ না-পেলে বলা যায় না ?'

তারের অন্য প্রান্তে অল্প হাসলো আঁখি।

'তাহ'লে ব'লেই ফেলি। পাখির বিয়ের কথা আরকি।'

'ও।'

'দিদির দেওর আছে অনঙ্গ, তার সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাবে।'

'ও।'

'বৌদি, এই নিয়ে তিনবার হ'লো।'

'এ-বিষয়ে আমার কী বলবার থাকতে পারে বলো ?'

'অনঙ্গ সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছে, কমার্সের ডিগ্রি নিয়ে।

'আর কিছু নিয়ে আসেনি ?'

'কী বললে ?'

'জিজ্ঞেস করছিলাম, কোনো সাদা মেয়ে বিয়ে ক'রে আনেনি কি ? তাহ'লেই তো এত সব হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে তোমরা।'

'ঠাট্টা নয়, বৌদি। আইডিয়াটা দিদির, বাবা লুফে নিয়েছেন। পাখিকে সেইজন্যেই তো আমার এখানে রেখে যাওয়া। বাবা বলেন, এর চেয়ে ভালো কিছু হ'তে পারে না।'

'আর কে কী বলছে ?'

'সত্যি বলছি, বৌদি, তোমার এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা মোটে ভালো লাগছে না।'

'এ ব্যাপারে কিছু কি আছে যা আমি করতে পারি ?'

'পারো বইকি। ধরো, আজকে তোমার বাবলির জন্মদিনে অনঙ্গকে বলতে পারো।'

'কলকাতায় আরো যে-সব ছেলে কমর্সের ডিগ্রি নিয়ে বিলেত থেকে এসেছে তাদেরও একটা লিষ্টি পাঠিয়ে দিয়ো।'

'বৌদি শোনো, আমাদের জন্যে এটুকু তুমি করো অন্তত। অনঙ্গকে আসতে বলো আজ বিকেলে—পাখিও তো থাকবে—ওদের দেখাশোনা হোক্।'

'ও, পাতানো কোর্টশিপ। পুতুল নাচ। দড়ি টানবে কে? তুমি? না যোগ্যতর আর কেউ আছে?'

'বাঃ, এতে তুমি দোষ দেখলে কী? আজকালকার বিয়ে তো সব এইভাবেই হয়।'

'তাই নাকি? এতদিনে আমরা রীতিমত সিভিলাইজড্ হয়েছি— কী বলো?'

'তুমি এ-রকমই বলবে আমি জানতুম। তাই তোমাকে কিছু বলতে চাইনি।'

'কার প্ররোচনায় বললে জানতে পারি কি?'

'ভেবেছিলুম দাদাকেই বলি। কিন্তু তিনি তো আবার তোমাকে জিজ্ঞেস না-ক'রে কিছুই বলতেন না।'

'আর যা-ই হোক্, আঁখি, তোমার সরলতায় মুগ্ধ না-হ'য়ে পারছিনে। তা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এ-বুদ্ধিটা কি তোমার নিজের, না অন্য কেউ ব'লে দিয়েছে?'

'তার মানে?'

'মানে—কেউ কি তোমাকে একটু আগেই কিছু বলেছে কি চিঠি লিখেছে কি টেলিফোন করেছে ?'

'সত্যি কথাই বলবো—দিদি একটু আগেই ফোন করলেন, কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু নয়।'

'আঁখি, আধা-সত্যি মিথ্যের চেয়েও খারাপ। শোনো: তুমি বললে, "আচ্ছা, আমি দাদাকে ফোন করছি।" সুমিতা জবাব দিলে, "না, দাদা তো তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না-ক'রে কিছু করেন না।" ঠিক কিনা, বলো !···কী, চুপ ক'রে যে ? সুমিতা আরো বললে: "আমার বলার চাইতে তোর বলাই ভালো, আঁখি। আর আমি যে কিছু বলেছি তা যেন ওঁরা জানতে না পারেন।" তাই নয় কি ?'

একটু চুপ ক'রে রইলো আঁখি, তারপর হেসে উঠলো।

'হার মানলুম, বৌদি, তোমার কাছে। তা এতে দোষ কী, বলো ? বোনের বিয়ের চেষ্টা কি করতে নেই ?

'আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, আঁখি, শুধু তোমাদের এই ছোট নাটকটিতে আমাকে যে পার্ট নিতে বলছো—'

'আহা—অনঙ্গ এলে তোমার বাড়ি তো আর অপবিত্র হ'য়ে যাবে না।'

'যে-মানুষের সঙ্গে কখনো তোমার আলাপ নেই, যাকে তুমি চোখেও ছাখোনি, তাকে কি তুমি মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে ?'

'তোমার নিজের কিছু করতে হবে না, বৌদি। আমাকে অনুমতি দাও, ওকে নিয়ে আসবো।'

'এতই যদি গরজ, তোমার নিজের বাড়িতে ওকে আনলেই তো হয়। কি পাখিকে নিয়ে মাঝে-মাঝে যেতে পারো সুমিতার বাড়িতে।'

'ছাখো, সে-কথা কি আর না-ভেবেছি! তবে আমার বাড়ি তো আমার নিজের নয়; শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন, ননদ আছে দু'জন···বুঝলে না, যদি কেউ কিছু মনে করে—'

'কেন, মনে করবার কী আছে! ওরা তো আর মিস্‌বিহেভ করবে না।'

'কী যে বলো! তবে ঐ নিয়েই হয়-তো কথা উঠবে এটা ওটা। বিয়ে হ'লে মেয়েদের যে কত জ্বালা তা তুমি আর বুঝলে কোথায়!'

'অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ, আঁখি।'

'তাহ'লে তুমি কী বলো?'

'আমি বলি পাখি সুমিতার ওখানে গিয়েই কিছুদিন থাক্ না। তুমি ওর যা, সুমিতাও তা-ই, বাধাটা কী? ইত্যবসরে নিমন্ত্রণচিঠিও ছেপে ফেলতে পারো তারিখ ব্ল্যাঙ্ক রেখে।'

'আমরা ভেবেছিলাম প্রথম দেখাটা তোমার ওখানে হ'লে—'

'কোর্টশিপের মালগাড়ি বুঝি তোমরাই চালাবে? প্রথম ইষ্টিমটা শুধু আমাকে দিয়ে দিতে বলছো—এই তো?'

'বুঝেছো ঠিক। এবার তোমার মতটা শুনি?'

'মত নেই।'

'বৌদি, অনঙ্গও আসতে চায়, দাদার সঙ্গে আলাপ করতে

উৎসুক। তুমি যে কী বলো আমি বুঝতেই পারিনে। এতে কী এমন দোষ হ'তে পারে বলো তো! ও তো আত্মীয়রই মধ্যে।'

'এবং শিগগিরই তোমাদের নিকটতর আত্মীয় হবে, আশা করি।'

'আমাদের এই সামান্য কথাটা তুমি রাখবে না?'

'রাগ করলে, আঁখি?'

'না, রাগ করিনি, তুমি যদি অন্য-কেউ হ'তে তাহ'লে রাগ করতাম।'

'আমার উপর রাগ ক'রেও আমাকে কৃতার্থ করবে না তোমরা। এসো কিন্তু বিকেলে ঠিক।'

'আসবো।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে বরুণা ঘরে ফিরে এলো। ভেবেছিলো এক্ষুনি বাইরে যাবার কাপড় পরবে, কিন্তু এই টেলিফোনের আলাপের-পরে একটু বিশ্রাম দরকার। আলগোছে বসলো তার খাটের ধার ঘেঁসে, বালিসে কনুই রেখে। তুমি যদি অন্য-কেউ হ'তে তাহ'লে রাগ করতুম। কথাটার মহৎ গুণ তার সততা। আঁখি সুমিতা নয়: মনের ভাব গোপন করতে পারে না সে। এইমাত্র যে কথাবার্তা হ'লো তার শাঁস বার ক'রে নিলে কী দাঁড়ায়? তোমাকে দু' চক্ষে দেখতে পারিনে, কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমাদের একটি কাজ করিয়ে নিতে চাই। সুমিতা, আঁখি···তার

স্বামীর বোনেরা, আত্মীয়রা, তার সম্বন্ধে তারা কী ভাবে খুবই ভালো ক'রে জানে সে। মানুষের বিদ্বেষ যদি মারতে পারতো বরুণা এতদিন বেঁচে থাকতো না নিশ্চয়ই। বিদ্বেষকে রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করবার উপায় এখন পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে বেরোয়নি, যদি বেরুতো তাহ'লে সে যা বিষ হ'তো তার এক শিশিতে ধ্বংস হতে পারতো সমস্ত মনুষ্যজাতি।

সে-ও পছন্দ করে না ওদের। ওরা যদি তার 'আত্মীয়' না-ও হ'তো তবু করতো না। ওদের সঙ্গে কোনোরকম মিল নেই তার। অথচ এদেরই পরিবারের একজনকে সে বিয়ে করেছে। একই রক্ত বইছে প্রশান্তর আর সুমিতার শরীরে। অনেক পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই দু' জনে খুব নাকি ভাব ছিলো ছেলেবেলায়। সুমিতার কয়েকটি পুরোনো চিঠি সে দেখেছে: দাদা বলতে অজ্ঞান। এখন ও-সব চুকে গেছে। এখন একজন আর-একজনের ঠিক উল্টো···তা-ই মনে হয়। প্রশান্ত বোনকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় মনে করে; আর সুমিতার মনে আক্রোশ আর সন্দেহ···হয়-তো ঘৃণা···হয়-তো করুণা।

তবু—এরা যে পরস্পরকে একেবারে ভুলে থাকবে, পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে নিয়ে শান্তিতে থাকবে তাও নয়। এটাই রক্তের টান বুঝি। রক্ত জলের চেয়ে গাঢ়। রক্তের কাছে আমাদের ঋণ কতটা? আমাদের ব্যক্তিত্বের কতখানি আসে 'রক্ত' থেকে, আর কতখানি আসে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, জীবনের সচেতন সাধনা থেকে? এ-বিষয়ে এখনো আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট। তবে এটা দেখা যায়

যে রক্ত এক হ'লেই কিছু হয় না: মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ক্ষেত্র সম্পূর্ণই আলাদা। এটাও দেখা গেলো, বরুণা মনে-মনে হেসে ভাবলে, যে রক্ত একেবারে বোবা হ'য়েও থাকে না কখনো, তার একটা দাবি আছেই। প্রশান্তর জীবনে এরা এখন কিছুই নয়, তবু জীবন থেকে একেবারে সরিয়ে দেয়াও যায় না। টান একটা আছেই সত্যি, যার ফলে দেখাশোনা, সমালোচনা, একের ব্যাপারে অন্যের নাক ঢোকানো, একের অনুপস্থিতিতে অন্যকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছেঁড়া। আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের সত্যিকারের সংস্পর্শ কিছুই নেই, তবু যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলি তার কারণই এই যে তা না করলে আক্রোশটাকে নতুন খাদ্য জুটিয়ে-জুটিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে। যাতে পরস্পরের সম্বন্ধে আলোচনা করবার ছোটখাটো খুঁটিনাটির কখনো অভাব না হয়, এইজন্যেই দেখাশোনা মেলামেশা। রক্তের টান।

বরুণা হাত বাড়িয়ে পাশের গোল টেবিল থেকে উপুড় করা বইখানা টেনে নিলে। আত্মীয়কে বেছে নেয়া যায় না। স্বামী বেছে নেয়া যায়, বন্ধু বেছে নেয়া যায়। বরুণার অনেকদিন মনে হয়েছে এই বন্ধুতারূপ সম্পর্কটা মানুষের সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাকে ভালো লাগে তার কাছে যাই। ভালো লাগা না-লাগা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন। আত্মীয় যদি হয় মূর্খ কি মিথ্যুক, ইতর কি লম্পট, তবু সে আত্মীয়, আমার: জন্মের আগেই সেটা ঠিক হ'য়ে আছে। তার সঙ্গে আমার নাম জড়ালে তাতে বাধা নেই। বাধ্য আমি সেটা মানতে। অন্ধ অদৃষ্টেরই অংশ

এটা। বন্ধু সৃষ্টি। বন্ধুর মধ্যে নিজের প্রসার ও প্রকাশ। এ-সম্পর্কটা প্রকৃতই ব্যক্তিগত : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। আত্মীয়র দরকার নেই ভালো হবার, তাকে ভালো লাগবার কথা ওঠে না; বহু প্রাচীন একটা সংস্কারে তার প্রতিষ্ঠা। বন্ধুকে দাঁড়াতে হয় নিজের পায়ে; সে তো সংস্কার নয়, সে আবিষ্কার। আবিষ্কারের যোগ্য কিছু-না-কিছু থাকতেই হবে তার মধ্যে। ভালো লাগবে তাকে, তাকে ভালো হ'তে হবে।

বরুণার চোখ হাতের বইখানার উপর, কিন্তু একটা লাইনও সে পড়ছিলো না। বইখানা হালের উপন্যাস, লেখক নামজাদা, আদ্ধেক পড়া হ'য়ে আছে বরুণার, আটকে গেছে চলতি বিলিতি রাজনীতির গর্তে প'ড়ে। এখন পড়া হবেও না, উঠে গিয়ে স্যাণ্ড্উইচগুলোর ব্যবস্থা ক'রে ফেললে হয়। বারোটা বেজে গেছে। বাবলি সুর করে' 'ছোট্ট রামায়ণ' পড়ছে, বেশ লাগছে শুনতে। আজ ওর জন্মদিন। পাঁচ বছর আগে এই তারিখে ও জন্মেছিলো। উঃ, কী কষ্ট! এটা কি আশ্চর্য নয় যে শরীরের যে-কোনো কষ্ট শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা ভুলে যাই? শরীরের কষ্ট স্মৃতি রাখে না। তা যদি রাখতো কোনো মেয়ের দ্বিতীয়বার সন্তান হ'তো না। বরুণা মনে-মনে হাসলো। মনে পড়লো তার মা-র কথা। সবসুদ্ধ তেরোজনের মা, দশজন জীবিত। সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও যে জীবিত এটাই আশ্চর্য।

মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক সাধারণত জীবন আরম্ভ করে ভালোভাবে, যত দিন যায় আস্তে-আস্তে গরিব হ'তে থাকে।

রয়েছে: আর কিছু নেই। যেন কবে কোন্ স্বপ্ন দেখেছিলো, যেন আর কারো জীবনের একটা ছবি-আঁকা পাতা। স্বামী আসতেন ছুটি-ছাটায়, বলতেন শিগগিরই তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। গেলো একদিন সে কলকাতায়, স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে। অনেক ভুগলেন তিনি, সে আশ্চর্য সেবা করলে। শাশুড়ি বললেন, অনেক ভাগ্য তোমার মতো বৌ পেয়েছি।

শ্বশুর-শাশুড়ি প্রথম থেকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাকে। সে-স্নেহের চরম পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। মানুষ মরে, দৈবদোষে সমস্তটা অভিশাপ পড়ে তারই উপর, যার সব চেয়ে বড়ো সর্বনাশ হ'লো। তারপর আমাদের হিন্দু সাধ্বীর পিতৃগৃহে অবজ্ঞার আশ্রয় যদি জোটে, তারই জন্যে চিরকৃতজ্ঞ সে। কিন্তু শ্বশুরশাশুড়ি তাকে পরিত্যাগ করলেন না: এ-দয়া তার মনে থাকবে। বিধবা হবার পর থেকেই তাঁদের প্রতি সত্যিকারের মমত্ববোধ জন্মালো তার। শ্বশুরের প্রতি, বিশেষ ক'রে। মহৎ চরিত্রের মানুষ তিনি। যত দেখলো সে, ততই ভালো লাগলো।

র'য়ে গেলো সে শ্বশুরবাড়িতেই। কেমন লেগেছিলো তার? বৈধব্য সুখকর ঠেকেনি নিশ্চয়ই। কিন্তু কোনো একরকম ক'রে মেনে নিয়েছিলো। যা-ই বলো, পৃথিবীতে সকলের জীবনই একভাবে কাটবে তার তো কোনো মানে নেই। চট্টগ্রামের সেই মস্ত চুপচাপ বাড়ির নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সে নিজেকে। একটু কাজ করে, একটু চুপ ক'রে ব'সে

থাকে ; কখনো সেলাই করে কখনো পড়ে কখনো ঘুমোয় : দিন কেটে যায়।

এমনি ক'রেই আরো কতদিন কাটবে কি কাটতে পারে সে-ভাবনা তার হয়নি, হয়েছিলো তার শ্বশুরের। দুর্ঘটনার কিছুকাল পরে তিনি তার বাপকে লিখে পাঠালেন : ইচ্ছে করলেই তিনি তাঁর মেয়ের আবার বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। বাপ যা জবাব দিলেন তার ভাবার্থ এই যে একই মেয়ের দু'বার বিয়ে দেবার সাধ্য তাঁর নেই, তাঁর ঘরে এখন আরো মেয়ে বড়ো হচ্ছে। অগত্যা শ্বশুর তাকেই বললেন সে কি আবার বিয়ে করতে চায় ? সে স্পষ্ট না বললে। শ্বশুর বোঝালেন, সমস্তটা জীবন কী ক'রে কাটবে। তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে এ-কথা ভাবতে পারিনে, কিন্তু তোমার সুখের পথে বাধা হ'তে পারিনে। তুমি যদি অমত না করো, আমিই চেষ্টা ক'রে—

বরুণা পা দুটো খাটের উপর তুললো। একটু শুয়ে নেবে। বইখানা হাতেই আছে, শেষের দিকের একটা পাতা খুলে হঠাৎ একটু চোখ চোখ বুলিয়ে গেলো। এই মেয়েলি অভ্যেসটাকে এখনো সে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেনি : উপন্যাস পড়তে-পড়তে ট ক'রে পিছন দিকটা একটু দেখে নেয়। সে তখন কিছুতেই রাজি হয়নি। কেন রাজি হয়নি ? ঈশ্বর জানেন। স্বামীর স্মৃতি কি মনের মধ্যে পুড়ছিলো ? কিন্তু কী স্মৃতি ছিলো তার, কী থাকতে পারে ? এক অসুখের দীর্ঘ দুটো মাস···কিন্তু সে-সময়টা একটা মোহের মতো কেটেছে তার, পরে ভালো ক'রে মনে

করতেও পারতো না। আশ্চর্য সেবা করেছিলো সে, লোকের মুখে শুনেছে। কিন্তু করবে না কেন, কে-ই বা না করবে? কাউকে কি চোখের উপর মরতে দেখা যায়? আর সব যখন শেষ হ'লো—তার মন একেবারে শূন্য, ইচ্ছাহীন শোকহীন উদাসীন। বোধ হয় এতই উদাসীন যে নিজের সম্বন্ধে কোনো ভাবনারও স্থান নেই সেখানে। শ্বশুর যখন এমন কথা বললেন যে দ্বিতীয়বার তার বিবাহ হ'তে পারে, দস্তরমতো অবাক হয়েছিলো সে। এ কি কখনো হয়!

ই্খানা রেখে দিয়ে বরুণা চোখ বুজলো। জীবনটা বড়ো সে-সময়ে শ্বশুর নিজে চেষ্টা ক'রে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ও যখন সে সত্যি-সত্যি একদিন নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করলো তখন এমন কিছু নেই তার বিরুদ্ধে তিনি যা না করতেন—যদি সে-রকম কোনো সুযোগ সে দিতো। সত্যি সে শ্রদ্ধা করতো তাঁকে, তাঁর মহত্ত্ব আর স্নেহ যে খাঁটি নয় এ-কথা ভাবতে কষ্ট হয়। তিনিই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় কলেজে পড়তে। থাকতো মিশনারি হস্‌টেলে, সরু পাড় কাপড় পরতো, আমিষ খেতো না। অন্যান্য মেয়েদের চাইতে কোনো বিষয়ে সে খারাপ আছে, এ-কথা ন হয়নি। খাওয়াটা যা-ই বলো অভ্যেসের ব্যাপার। একখানা সাড়ি পরতে না-পাওয়ার দুঃখ এমন-কিছু নয় যার জন্যে জীবনটাকে ট্র্যাজিডি ক'রে তোলা যায়। নিজেকে সুখী ছাড়া অন্য-কিছু ভাববার কারণ হয়নি কখনো। ভালো লাগতো লেখাপড়া, ভালো লাগতো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব, ভালো

লাগতো কলকাতার বিস্তীর্ণ বিশাল জীবন। আই-এ পাশ করলো, বি-এ পাশ করলো, এম্-এ পড়তে যাবে এমন সময় প্রশান্তর সঙ্গে তার দেখা।

প্রশান্তর বাপ সব-জজ। সারা জীবন বাঙলাদেশের নানা দুর্গম কোন-ঘুপচিতে কাটিয়ে শেষ বয়েসে বিরাট প্রাসাদ তুলেছেন বালিগঞ্জে। অগাধ পয়সার মালিক। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে। পেন্সন নিয়ে আবার জজিয়তি করছেন বাঙলাদেশের কাছাকাছি এক নেটিব রাজ্যে। সলিড মানুষ। একমাত্র ছেলে প্রশান্ত, তার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল রঙেই তিনি এঁকে রেখেছিলেন—এবং এঁকেই অবিশ্যি ক্ষান্ত হননি, সব রকম তোড়জোড় আঁটঘাট ঠিক ক'রেও রেখেছিলেন। কিন্তু পাছে মুন্সেফ হ'তে হয় সে-ভয়ে প্রশান্ত আইনই পড়লো না। ইয়োরোপে গেলো—একরকম জোর ক'রেই। বাপের নিতান্ত অমত ছিলো। ছেলেকে বিলেত পাঠাবার কোনো অর্থ হয় না আজকালকার দিনে—অতগুলো টাকাই জলে ফেলা। এক যদি সিবিল সার্বিস—তা আজকাল তো এ-দেশেই···। আই-সি-এস দিলে না প্রশান্ত, এ-দেশেও না, বিলেতেও না। ভর্তি হ'লো লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে, হ্যারল্ড ল্যাস্কির প্রভাবে পড়লো, সোশ্যালিজম্-এর নতুন মদ পান ক'রে ফিরে এলো স্বদেশে।

দেশে ফিরেই বরুণা। অতি দৈবাৎ দেখা হ'লো, তারপর মনে হ'লো আবার দেখা না-হ'লেই চলবে না। এখনো অবাক লাগে বরুণার, সে-সময়কার উন্মত্ততার কথা ভাবতে। কী

উৎসুকতা আর কত উৎকণ্ঠা, কত আশঙ্কা আর কত রোমাঞ্চ। কারণ প্রশান্ত তখন অবিশ্যি বাপের বাড়িতে থেকেই চাকরির চেষ্টা করছে। আর বরুণা থাকে হস্টেলে; সুতরাং দেখাশোনার একটা নির্দিষ্ট জায়গাই নেই। এই পার্ক, ঐ রাস্তার মোড়, তারপর রেস্তোরাঁ আর সিনেমা, প্রতিদিন ছাড়াছাড়ির আগে পরের দিনের সময় ও স্থান নিরূপণ। রীতিমতো নভেল। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিলো না তাদের। রোদ্দুরে ভুরু কুঁচকে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে লেডলর বাড়ির সামনে, অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে বিকেলের আলোয় উটর‍্যামের মূর্তির কাছে, চৌরঙ্গিপাড়ার রেস্তোরাঁর শূন্য টেবিলে ব'সে কত পুড়িয়েছে অকারণ সিগারেট। এ-রকম কেন হ'তো যে প্রায় সব সময়ই তার পৌঁছতে দেরি হ'তো?—এই অপেক্ষা করবার যন্ত্রণা কম পায়নি প্রশান্ত। তার এই দেরি হওয়াটা কি স্ত্রীলোকের কোকেট্রি-প্রবৃত্তিরই একটা প্ররোচনা? নাকি সে দু' সিঁড়ি নেমে আবার উঠে যেতো আরো একবার আয়নায় মুখ দেখতে? এটা তার মনে পড়ে যে প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে সে সঙ্কল্প করতো: আজ আর যাবো না। মনে-মনে ভাবতো, এ কী পাগলামি করছি আমি, এ এক দুরন্ত হাওয়া কোথায় ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে। কিন্তু সময় যতই ঘনিয়ে আসতো, সঙ্কল্প আসতো শিথিল হ'য়ে। তবু হয়-তো প'ড়ে থাকতো জোর ক'রে, অপারেশন টেবিলে ক্লোরোফর্মের অপেক্ষায় রোগীর মত; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠতো শেষ মুহূর্তে…। এ-রকম তার প্রায়ই হ'তো, দেরি বোধ

হয় হ'তো সেইজন্যেই। আয়নার দিকে দু' চারবার তাকাতো তা-ও ঠিক, একটু প্রসাধন করতো তাও মিথ্যে নয়। সে-সময়টায় সত্যি তার মাঝে-মাঝে একখানা ভালো সাড়ি পরতে ইচ্ছে করতো।

এ-রকম দেখাশোনা করবার কতই বা জায়গা আছে কলকাতায়! চায়ের পেয়ালা নিয়ে অনেক দেরি ক'রেও কতক্ষণই বা বসা যায়, ছবি না-দেখে সিনেমা গৃহের রুদ্ধ হাওয়ায় আটকে থাকা যায় কতক্ষণ! এ আর বেশিদিন চলবে না, চলতে পারে না। কিন্তু তারপর? তারপর···? কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সেই দিনরাত্রিগুলো কেটেছে। এখন এই ভেবেই অবাক লাগে কী ক'রে সহ্য করেছিলো। আর সেখানেই তো শেষ হয়নি!

বরুণার শরীরটা অল্প নড়লো বিছানায়। বাবলির রামায়ণ পড়া আর শোনা যাচ্ছে না। ঘুমিয়ে পড়েছে। তারও যেন ঘুম পাচ্ছে, বেরোবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। সে-ই প্রথমে বলেছিলো কথাটা। 'এ কী পাগলামি করছি আমরা!' প্রশান্ত মৃদু হেসে বলেছিলো: 'পাগলামি করছিই যখন, শেষ পর্যন্তই করা যাক্।' তারপর এমন দিন এলো যখন দু'জনের মধ্যে আর কোনো আড়াল রইলো না। মনে-মনে অনেক আগেই যা বুঝেছিলো, তা বলা হ'য়ে গেলো মুখে। বলা হ'য়ে গেছে: এখন তারা নগ্ন, পরস্পরের সামনে সম্পূর্ণ উন্মোচিত, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা কাঁপছে। 'কয়েকদিন আমাদের এখন দেখা না-ই হ'লো', বরুণা বললে।

'পাগল !' …াই না', বললে প্রশান্ত।

'যদি কেউ দেখে …দি লক্ষ্য করে ?'

'সে-আশঙ্কা তো আছে… …ী, আমরা তো শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত।'

তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে প্র…

'যেদিন আমার একটা চাকরি হবে, সেইদি… করবো।'

'কেন ?'

'বিয়ে করবো কেন জিজ্ঞেস করছো ?'

'না। চাকরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কেন ?'

'যেহেতু আমার বাপ হচ্ছেন মূর্তিমান পৈশাচিকতা। তিনি তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না এবং আমাকে অর্দ্ধ পয়সা না-দিয়ে বিদায় করবেন।'

'কোনোরকম ক'রে থাকতে পারবো না আমরা ?'

'কোনোরকম ক'রেই হয়-তো পারি।'

'আমি পারবো মাষ্টারি করতে', বরুণা বললে।

ঠিক করলে তারা, লুকিয়ে বিয়ে করবে। সেটাই স্বল্পতম প্রতিরোধের পথ, যাকে বলে লাইন অব লীস্ট রেজিজটেন্স্। জানাতে গেলেই এমন একটা ধূলোর ঝড় উঠবে…তার চাইতে আগে হ'য়ে যাক্ তো, তারপর যা থাকে কপালে। অ্যাক্ট থ্রী হ'লো সহায়, বিয়ে হ'য়ে গেলো। সোমনাথ—আড়ালে থেকে ব্যাপারটা সে প্রায় প্রথম থেকেই লক্ষ্য ক'রে আসছিলো, এবং

এমন সময় যখন এলো যখন কাউকে না-বললেই চলে না, তখন প্রশান্ত তাকেই বলেছিলো—হ'লো সাক্ষী, এবং আরো দু'জন। যারা ছিলো প্রশান্ত আর বরুণা তারা হ'লো স্বামী-স্ত্রী।

বিয়ের পরেই একজনের কথা বরুণার মনে হ'লো। তার শ্বশুর—মানে, প্রথম পক্ষের। একটা চিঠি লিখতে হয়। লিখলো চিঠি, একটু কায়দা ক'রেই লিখলো। আপনি অনেক আগে যেটা বলেছিলেন তার মর্ম আমি এতদিনে উপলব্ধি করলাম। আমি বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়েছি, আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উত্তরে এলো পাঁচ পাতা জোড়া যে-মর্মভেদী চিঠি—এ-রকম বরুণা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। ন'না খবর তাঁদের কানে আগেই পৌঁচেছে, বোঝা গেলো। লোকে লক্ষ্য করেছে। তোমার গুপ্তপ্রণয়ের কথা আগেই শুনেছিলাম। আর যা-ই হোক্, লোকের ভাষাটা অন্তত ভদ্র হ'তে পারে। সে নাকি ফিরিঙ্গি হোটেলে খানা খেয়ে নেচেছে, ডুবে রয়েছে নানা প্রমোদ-বিলাসে, তার প্রকাশ্য প্রণয়াচরণ নির্লজ্জতার একটা দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকবে। তোমাকে শিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম, শিক্ষা হ'লো আমার। এ-কথাটা লিখেছিলেন ভালো, বরুণার একটু হাসিও পেয়েছিলো কথাটা প'ড়ে। অর্থব্যয় কম হয়নি আমার। তা ছাড়া আমার মৃত পুত্রের লাইফ-ইন্সিয়োরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা তোমারই নামে আছে ব্যাঙ্কে। আইনত ও-টাকা তোমার। আমার খুব বিশ্বাস কোনো বখাটে অপদার্থ ছোকরা ঐ টাকার লোভে তোমার মন ভুলিয়েছে।

নয় তো তুমি ও-রকম মেয়ে তো নও। এতদিন বিয়ে না-ক'রে আজ হঠাৎ তোমার মনের বদল হ'লো কেন ? তুমি মন স্থির ক'রে ফেলেছো ব'লেই মনে হচ্ছে : তবু বলি, যদি পারো এখনো ফিরে এসো, সর্বনাশ হবে তোমার, শেষটায় পথে দাঁড়াতে হবে।

সর্ব্বনাশ হোক্ তোমার—এ-কথাটা লিখতে নিতান্তই বুঝি বাধলো। আর এতদিন বিয়ে করেনি ব'লেই আজও করবে না, এ কেমনতরো অদ্ভুত কথা! এতদিন তো প্রশান্তর সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

...া তার মনেই ছিলো না। সত্যিই তো, পাঁচ ... সে। দাবি করলে না-দিয়ে উপায় নেই। ... সমাধান হ'য়ে যায়। নীতিবিরুদ্ধ হবে কি, ঠিক রুচিমাফিক হবে না ? যে-ভাবে মানুষের ঘরে টাকা আসে, যে-ভাবে মানুষের টাকা বাড়ে সবই কি নিখুঁত রুচি ও নীতি-সঙ্গত ? অন্যায় উপায়ে যে পয়সা করেছে তার পিছনে কি আমরা কুকুর লেলিয়ে দিই ? যে করেছে সে তো উৎরেই গেছে, যে পারেনি তাকেই ধ'রে মারো। পয়সার ব্যাপারে আর-কিছুই পাপ নয়, অকৃতকার্য হওয়াটাই শুধু পাপ।...একটা দিন দ্বিধায় কেটেছিলো বরুণার। প্রশান্তকে কিছু বলেনি অবিশ্যি, কথাটা শুনতেও তার খারাপ লাগতো। যখন সে শুনলো, তখন বরুণা ভূতপূর্ব শ্বশুরকে চিঠি লিখে পাকা সরকারি দলিল আনিয়ে টাকাটা বদলি ক'রে দিয়েছে তাঁরই নামে। টাকাটা যে তার এ সে কখনোই ভাবতে শেখেনি, সুতরাং নিতান্ত মহত্ত্বহীন মমত্বহীন

এই ত্যাগ। আর সত্যিই তো, শ্বশুর তার জন্য অর্থ
করেননি।

এদিকে প্রশান্তর বাড়িতে যে ঝড় উঠলো তার জের মি
বছর পরে, যখন প্রশান্তর হঠাৎ স্কচ্ সওদাগরি আফি
চাকরি জুটে গেলো। মিটলো—মানে, বাইরে মিটলো, অ
পৃথিবীর পক্ষে, বরুণা ভাবলে, এই পৃথিবীর পক্ষে তা-ই
যেমন ঘ'টে থাকে সবই ঘটলো, তবে এতটা যে হবে, কি হ'
তা ভাবতে পারেনি। কোনো মোহ ছিল না তাদের মনে,
জানা কথাই যে তারা পরিত্যক্ত হবে। নেটিব-স্টেটের বি
ত্যাগ করলেন প্রশান্তকে, লিখলেন: এক পয়সা তুমি আমা
না, এবং ইহজীবনে আর তোমার মুখ দেখবো না। প্রশা
কাঁদতে-কাঁদতে শয্যা নিলেন—ছেলে ম'রে গেলেও এত কষ্ট
তাঁর হ'তো না। আর···বোনেরা। কত কথা যে বরুণার
এলো···তার চেহারা নিয়ে, তার চরিত্র নিয়ে, তার অতীতে
কাল্পনিক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এতে অবিশ্যি সন্দেহই
সে-ই নানা জটিল কৌশলের জাল ফেলে তাদের দেবদূত ভাই
পাকড়েছে। রূপ তো তার নেই-ই, অতি সাধারণ স্বাস্থ্য
(সে খবর পেলো কবে নাকি তার একবার যক্ষ্মা হয়েছিল
বয়েস তার প্রশান্তর ডবল, আর মন তো তার একটা
যে-শ্বশুর অমন ভালোবাসতেন; তাঁর বুকে কুড়োল মেরে এই
করা—এতেই তো বোঝা যায় সে কেমন মানুষ। সেই
প্রতি দরদ উথলে উঠলো বোনেদের···আর এদিকে সেই

ন, ও তো সত্যি খারাপ মেয়ে ছিলো না, ঐ স্কাউণ্ড্রেল
াই···ভারি মজার ব্যাপার।

ারি মজা, সত্যি। কিন্তু কখনো-কখনো দু'একটা কথা
: লাগতো। কথাগুলো যে তার কানে এসে পৌঁছতো
আশ্চর্য। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ব'লে তো সুখ নেই,
না দরকার। সুতরাং আত্মীয়দেরই মধ্যে দু'একজন
ভূতির ভেট নিয়ে যাওয়া-আসা করতেন; অনেক আহাতে-
মাখামাখি হ'য়ে আসল কথাগুলো অদ্ভুত কায়দায় বেরিয়ে
তা। বিয়ের জন্যে এত তাড়া কেন সেটা অবিশ্যি কারুরই
বাকি নেই। প্রশান্তকে ধ'রে রাস্তার চৌমাথায় বেঁধে
চাবুক মারা উচিত, বলেছিলেন বিজন ঘোষ। কথাটা
ঘোষেরই মতো: তার শাস্তির ধারণাতেও ফুটেছে তার
বর্বরতা। সুমিতা বলেছিলো, যে-মেয়ের একবার কপাল
, তার কি কখনো সুখ হয়! আবার পুড়বে ওর কপাল।
তাহ'লে তার ভাইয়ের অবস্থাটা কী হবে সেটা বোধ হয়
া ভেবে ছাখেনি।

সই সুমিতা আর বিজন আজ তাদের বাড়িতে আসবে।
কদিন থেকেই আসে। বিজন ঘোষের নিজের অনেক অর্থ,
র অর্থের প্রতিও শ্রদ্ধা কম নয়। প্রশান্তর অর্থে সব দোষ
গেছে—কথাটা এতই সাধারণ, এতই শস্তা যে ভাবতেও লজ্জা
। এ-সব নিয়ে কতদিন আর চালানো যায়, সত্যি! ভিতরে
থাক্, বাইরে একদিন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসেই। প্রশান্তর

বাবা মাও একবার এসেছিলেন। খুব ক্রিটিকল চোখে ে
বাড়ি-ঘর আসবাব-পত্র তাদের বাইরেকার জীবনযাত্রা। ◦
বোধ হয় পাশই করেছিলো তারা। কুশলজিজ্ঞাসার চিঠিও
মাঝে-মাঝে। আর আজ বরুণাকে বলা হচ্ছে প্রশান্তর
বোনের পাতানো কোর্টশিপের চক্রান্তে সাহায্য করতে।' এ
সময় তার মনে হয় সেই আগেকার দিনে অতি দুঃখেই তারা
ছিলো। লভ ইন্ এ কটেজ।

ঠিক কটেজও জোটেনি, টালিগঞ্জে একতলার ফ্ল্যাট।
বললেই ভালো হয়। তাও দু'খানা মাত্র, আর আর এক
বারান্দা। পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, সস্তাই বলতে হবে। ে
খুঁজে দিয়েছিলো। অনেক-কিছুই করেছিলো সোমনাথ,
যে করতে পারেনি সেটা তার দোষ নয়। তার মারফৎ
টিউশনি আসতো প্রশান্তর সেগুলোই ছিলো সেই সময়ে
প্রধান উপজীবিকা। এই পৃথিবীতে গরিবের মতো থাকতে
টাকা দরকার এবং কলকাতায় সেটা নেহাৎ অল্প টাকাং
বরুণা মাষ্টারি করতে প্রস্তুত হয়েছিলো, কাছাকাছি একট
ঠিক ক'রেও এনেছিলো। কিন্তু প্রশান্তর বাবা কী ক'ে
পেয়ে ইস্কুলের কর্তাদের গিয়ে এমনই-কিছু বলেন যাতে
হ'লো না। কত কিছুই যে মানুষের পক্ষে সম্ভব! তার
আর চেষ্টা করেনি, এবং আরো কিছু পরে চেষ্টা করাও
হ'লো তার পক্ষে। বাবলির সূচনা হ'লো।

বড় কষ্টে গেছে সে-সময়টা। শরীর অত্যন্ত খারা

হচ্ছিলো তার। আর প্রশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গিয়েছিলো টাকার
জ্য। যত চেষ্টা করে, কিছুতেই যেন তার একটা চাকরি হবে
: মাসগুলো একে-একে কাটলো, যথাসময়ে বাবলি এলো।
ভেবেছিলো ম'রেই যাবে। মরলো না। একমাস হাসপাতালে।
 মন্দ হয়নি। ধার করার ক্ষমতা প্রশান্ত ততদিনে প্রায়
শেষ করেছে। সোমনাথ টাকা দিয়েছিলো। কথাটা মনে ক'রে
ার মতো নয়। বাস্তবজ... ...হায্য করতে পারা কি না-পারা
... করে। সোমনাথের পকেটে
... থাকতো, তবু সে সোমনাথ।

... ঘটনা থেকে তাদের যুগল জীবনে এক সোমনাথই
। ছিলো। সকল সমস্যায় সকল দুঃখে, পূর্ণতার অজস্র আনন্দের
ায়। এতদিনে এমন হ'য়ে গেছে যে তাকে বাদ দিয়ে
নটাই যেন ভাবা যায় না। আশ্চর্য মানুষ—এমন চুপচাপ কিন্তু
ীর নয়, মনটা একদিক থেকে এতই সহজ যে বাবলিরও সে-ই
ষ্ঠ বন্ধু। আর আশ্চর্য বন্ধুতা দু'জনের। এমন চুপচাপ নাকি
লো না, প্রশান্ত বলেছে, ঐ সুমিতা···সুমিতার বিয়ে হয় প্রশান্ত
লত থেকে ফেরবার পর, বরুণা তখনই খানিকটা শুনেছে
ান্তর কাছ থেকে। প্রশান্ত ক্ষমা করেনি বোনকে। এই
মিতাই ছিলো পরিবারের মধ্যে তার সব চেয়ে প্রিয়। আঘাতটা
 হয়েছিলো তার পক্ষেও। সুমিতা মানুষ হয়েছিলো প্রথম
কে তারই প্রভাবে···কিন্তু বিয়ের একমাসের মধ্যেই সে হ'য়ে
লো পাকা একটি মেয়ে-বিজন-ঘোষ···হয়তো সোমনাথকে বিয়ে

করলে তারই প্রতিচ্ছায়া হ'তো। নিজের কিছুই নেই বুঝি ওর, যার ছায়া পড়ে। প্রশান্তর সঙ্গে সব চেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার এই সুমিতাই করেছিলো···কিন্তু সুমিতা সে নয়, সে বিজন ঘোষ। আসলে সুমিতা ব'লে কেউ নেই।

বরুণার মন দার্শনিক স্তরে উঠে ছড়িয়ে গেলো। একটা শান্ত নিঃস্পন্দ ভাব নামলো তার মনে। ঘুমিয়ে পড়ছিলো বুঝি, হঠাৎ চমকে জেগে উঠলো। না, এখন আর ঘুমোবে না, এখন বেরুতে হয়। একটা বাজে বুঝি। আজ বাবলির জন্মদিন।

৪

গুটি দশ-বারো ছেলে নিয়ে অনার্সের টিউটরিয়ল ক্লাশ। এখানে চ্যাঁচাতে হয় না, ভদ্রলোকের মতো কথা বললেই চলে। এবং কথাগুলো পাঠ্যকেতাবের অভীষ্ট বৃষচক্ষুতে ঠিক না-লেগে এ-দিক ও-দিক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেও দোষ নেই। মাষ্টারির ছ্যাকরা গাড়িতে যারা কাঁধ জুতেছে পাঠ্যকেতাবের বাঁধা সড়কে ঘোড়দৌড়ই তাদের প্রধান সাধনা: এখানেই একটু পারা যায় আশেপাশের অলিতে-গলিতে ঢুলকি চালে ঘুরে বেড়াতে। চারতলার ছোটো ঘরটায় ঢুকে সোমনাথের একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিলো।

কিন্তু সে ক্লান্ত। পর-পর দু'ঘণ্টা দুটো বিরাট ক্লাশে গলাবাজি করেছে। শারীরিক শ্রমটা কিছু কম নয়—বোধ হয় শারীরিক শ্রমটাই সমস্ত। কাজটা শ্রমিকের কাজ, আসলে। এবং খানিকটা

কেরানির। প্রোফেসর কথাটাই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে সকলের মনে। নামের এর চাইতে বড়ো অলঙ্কার আর নেই। সে-ও প্রোফেসর। অনেক চিঠিতে তার নামের আগে শব্দটা বসায়। দেখতেও রোমাঞ্চ হয়। প্রোফেসর! নিজের সম্বন্ধে সোমনাথ ভেবে দেখেছে। এটা অতি সত্য যে সাহিত্য সে ভালোবাসে। পড়তে সে ভালোবাসে, নানা বিষয়ে তার আছে সজীব আগ্রহ, ঠিক যেটুকু জানলে আমরা অনধিকারচর্চা থেকে বিরত হই, সেটুকু প্রায় সকল বিষয়েই সে জানে। বোকা নয় সে, সেটা সত্যি! নিজে সে সাহিত্য সম্বন্ধে তীব্রভাবেই অনুভব করে, ভালো-লাগা মন্দ-লাগাগুলো একান্তই তার নিজের, বুক কোম্পানি থেকে মতামত কিনে আনতে হয় না। অনেক সময়েই অনেকরকম কথা তার মনে হয়, এবং চেষ্টা করলে উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে হয়-তো বলতেও পারে। ও-সব কথা ও-রকম ক'রে বলাই যদি তার কাজ হ'তো···যদি হ'তো! মূল্যবান হয়-তো হ'তো না—সাহিত্য সম্বন্ধে সে 'মূল্যবান' কিছু বলবে এ-কথা ভাবতেই তার হাসি পায়—তবে সরস হ'তে পারতো। এই একটা কথা হয়-তো সে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারতো যে সাহিত্য উপভোগের জিনিস; উপভোগে সাহায্যও করতে পারতো সম্ভবত। কিন্তু সরলকে সরলতরো করাই তার কাজ; তার কাজ অতি সরলকে অতি জটিল করা; ছিঁড়ে কেটে চেঁচে-ছুলে নীরক্ত নিষ্কণ্টক নিরুপদ্রব খণ্ডে-খণ্ডে সাহিত্য পরিবেশণ করা তার কাজ—যেটা অতি সহজেই গেলা যাবে এবং আরো সহজে উদ্গীরিত হবে পরীক্ষার

খাতায়। প্রেম ও যুদ্ধের মতো পরীক্ষা-পাশ ব্যাপারেও কিছুই অন্যায় নয়।

যাক্, আজকের দিনের কর্ম-কাণ্ডের প্রধান অংশটাই চুকেছে। সে চেঁচিয়েছে, প্রাণপণে চেঁচিয়েছে; যে-পঙ্ক্তি সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতেই বোধগম্য তা চটকে-চটকে বোঝাতে-বোঝাতে মুখে থুতু তুলেছে। যাক্, শেষ হয়েছে। পিছনের দিকে তাকাতেও আরাম। এটাও হ'য়ে গেলো ব'লে—তারপর ছুটি, তারপর একদিনের মতো আবার সে স্বাধীন মানুষ। এর পর আবার কাল। তারপরেও কাল। রোজ সে মনে করে কী ক'রে করবে সে, উৎসাহ পাবে কেমন ক'রে, শক্তি আসবে কোথা থেকে। কিন্তু একবার যখন ঝাঁপিয়ে পড়াই গেলো তখন আর খেয়াল থাকে না, হু-হু ক'রে ঘণ্টাগুলো কেটে যায়। আসে কাজ শেষ ক'রে রাস্তায় পা দেবার পবিত্র মুহূর্ত। এমনি ক'রে কাটে দিনের পর দিন··· তারপর একদিন একটা ছুটি আসে।

সত্যি বড়ো ক্লান্ত লাগে। তার গরম এবার এপ্রিল মাসেই বেশ পড়েছে। এই টিউটরিয়ল ক্লাশগুলোর পরিকল্পনা নিতান্তই বোধ হয় জীবে দয়া থেকে। তবু এখানেও, আস্তে-আস্তে কথা বলতেও বার-বার তাকে ঠোঁট চাটতে হচ্ছে জিভ দিয়ে। বিষয়টা তার মনের মতোই, কিন্তু ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছে না। এক ইংরেজ সমালোচকের আর্ট-সংক্রান্ত প্রবন্ধ এদের পাঠ্য, তাই থেকে উঠেছে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা। সোমনাথ ব'লে যাচ্ছে। কথাগুলো খুবই প্রাথমিক। যেমন কিনা,

পরিক্রমা

সুন্দর কাকে বলবো? সুন্দর কি নিজের মধ্যেই সুন্দর, না কি সুন্দর ক'রে দেখতে হয়, আঁকতে হয়? সুন্দর কি স্বয়ম্প্রকাশ, না কি আবিষ্কার করতে হয় তাকে? সৌন্দর্য কি বস্তুর নিজস্ব গুণ, না যে আখে তারই দৃষ্টির ভঙ্গি? চলতি কথায় যাকে সুন্দর বলে সে তো রঙের ও রেখার কতগুলো নির্দিষ্ট সমাবেশ মাত্র। সেখানে সুন্দর মানে দেখতে ভালো, চোখকে যা একটু খোষামোদ করে। যেটুকু তার দেখা গেলো সেটুকুতেই শেষ। আর্টের কাজ তাকে নিয়ে নয়; আর্ট প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে, সেখানকার প্রয়োজন আবয়বিক শ্রী নয়, আন্তরিক ব্যঞ্জনা। যেমন কিনা রবিঠাকুর বলেছেন, ছবি হচ্ছে চিৎপুর, চৌরঙ্গি নয়। চৌরঙ্গি নেহাৎই ফরমায়েসি মাল, কাটে-ছাঁটে নিখুঁত, কিন্তু চিৎপুরের আছে 'চরিত্র', তার সমস্ত নোংরামি আর কুশ্রীতা নিয়ে তার বিশেষ ও ব্যক্তিগত একটা রূপ আছে। এই যে বললাম 'রূপ', এটাই হচ্ছে সৌন্দর্যের সার। পুরোনো ভাঙাবাড়ির একটা রূপ আছে, মহামূল্য ড্রয়িংরুমের নেই। বিকেলের আলোয় একটি মেয়ে জানলায় ব'সে চিঠি পড়ছে, এ একটা ছবি। মেয়েটির 'চেহারা' কেমন সে-কথাই ওঠে না; সে সুন্দর। কিন্তু সর্বাঙ্গে জড়োয়া গয়না প'রে যে 'সুন্দরী' মেয়ে বিয়ের নেমন্তন্নে চলেছে মেয়ে-মহলে তার যতই সম্মান হোক্, সে সুন্দর নয়, ছবি হবার যোগ্যতা তার নেই। আছে অনেক মুখ অলৌকিক দীপ্তিতে অপরূপ, প্রায়ই তারা 'দেখতে ভালো' নয়। জিগফিল্ড সায়েবের ইঞ্চি-মাপা সুন্দরীদের সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না এলেন টেরির। রুডল্‌ফ্ ভ্যালেনটিনো

তাঁর সমস্ত বিখ্যাত সেক্স-অ্যাপীল নিয়ে তা পারতেন না, যা পারেন চার্লি চ্যাপলিন একবার চোখের পাতা নেড়ে। চেহারাটা কিছু নয়, চেহারা যেটাকে প্রকাশ করছে সেই চরিত্রই আসল। সেটাই রূপ।

সোমনাথ বেশ উৎসাহ নিয়েই বলতে লাগলো। সুন্দর ছবি মানে 'সুন্দরী' মেয়ের ছবি একমাত্র হেমেন মজুমদারের ইস্কুলেই। এবং সুন্দরী মানে রঙ ও যথেষ্ট রক্তমাংস। মোনালিসার ছবি আমরা ...সেই দেখেছি। 'সুন্দরী' বলা চলে না কিছুতেই। কিন্তু কী আছে তার মধ্যে হাজার বার দেখলেও যা পুরোনো হয় না? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সৌন্দর্য গায়ের রঙে চুলের রঙে চোখে আর ঠোঁটে নয়, সৌন্দর্য···

এইখানে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো সোমনাথ। হঠাৎ সুমিতার মুখে ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে, স্পষ্ট, জীবন্ত, জ্বলন্ত, পুঞ্জ-পুঞ্জ অগ্নিশিখা যেন। অনিবার্য, অনস্বীকার্য, রইলো ঝুলে এক মুহূর্ত তার চোখের সামনে, ছেলেদের মুখ আড়াল ক'রে। ছিঁড়ে গেলো তার কথার সুতো, রইলো চুপ ক'রে এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত, তার সমস্ত পারিপার্শ্বিক, কাঠের পার্টিশন দেয়া ঘর, জানলার বাইরে ছাদের ঢেউ-তোলা সহর···সব গেলো মিলিয়ে; শুধু রইলো সেই একটি মুখ, কুচকুচে কালো চুলে ঘেরা, ঠোঁটে বিদ্যুতের মতো হাসির ঝলক, টোল-খাওয়া ছোট্ট থুতনিতে যেন মধুর অভ্যর্থনা—ঘুমের আগের মুহূর্তে বোজা চোখে হঠাৎ দেখা কোনো ছবির মতো নিঃসংশয় স্পষ্ট। তার পরেই ফিরে এলো

সোমনাথ, রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলো, কথার ছেঁড়া স্থতো কুড়িয়ে নিয়ে আবার স্থরু করলে। খানিক পরেই ঘণ্টা বাজলো।

বই-খাতা হাতে ক'রে সে বেরিয়ে এলো, সিঁড়িব কাছে ছেলেদের ভিড়। সৌন্দর্য ব্যক্তিগত, সৌন্দর্য দৃষ্টিসাপেক্ষ : মানুষের সৌন্দর্য, সে বলেছে, শারীরিক নয়, চারিত্রিক। বিশ্বাস করে সে কথাটা। কিন্তু কোনো বিশুদ্ধ শারীরিক সৌন্দর্য নেই কি, সকল যুগে সকলের চোখেই যেটা সমান ভালো? অ্যাপোলোর মূর্তি, ভিনাস ডি মিলো…

অতি কষ্টে সে ঢুকলো ঘরে। বসলো চেয়ারে, বলবার আগেই বেয়ারা জল নিয়ে এলো। স্থমিতার সৌন্দর্য, সেটা কেমন? স্থূল, অতি স্থূল; শারীরিক, নিছক শারীরিক। ঢকঢক ক'রে সমস্তটা জল সে খেলো, জল খেয়ে-খেয়ে আর আশ মেটে না। পরিপুষ্ট চিতাবাঘ স্থন্দর লাগে আমাদের চোখে। এ-ও কি তেমনি? যাকে বলে অ্যানিমাল-বিউটি? সে গুছিয়ে নিলে তার চামড়ার বাক্স, কব্জিটা আবার এক-এক সময় এমন বিগড়ে যায়, কিছুতেই আটকায় না। কিন্তু স্থমিতা চিতাবাঘের মতো স্থন্দর, এ-কল্পনাটা কিছুতেই মনে আনা যায় না। স্থমিতা চিতাবাঘ… ভাবতে হাসিই পায়। বন্য পশুর সৌন্দর্য কেবলি আঙ্গিক সামঞ্জস্যে নয়, উপচে-পড়া দুর্দান্ত প্রাণ-শক্তির লীলায়। সে-জিনিস নেই স্থমিতার। চারিত্রিক মহিমা থেকেও সে বঞ্চিত। তবু সে এত স্থন্দর যে অবাক লাগে। কেন যে ঈশ্বর তাকে এত স্থন্দর করেছিলেন!

পরিক্রমা

বাক্স বন্ধ হ'লো, সোমনাথ উঠলো, দেয়ালে ঝোলানো ছাতাটি নিতে ভুললো না। সোজা বাড়ি গিয়ে চিৎপাত। দেড়টা বাজলো। বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকবে, সাড়ে-চারটের আগে উঠবে না। পড়বে নভেল, পড়বে কবিতার বই, কিছু পড়বে না, কিছু করবে না। একটু ঘুমিয়ে নেয়াই ভালো, বিকেলে তো আবার সেই পার্টি। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগবে তার সেখানে গিয়ে। তবু যেতেই হবে। এখন বাড়ি যাবার পথে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে নেমে কিছু নিয়ে যাবে বাবলির জন্যে। বড়ো ক্লান্ত, কিন্তু এখন না-কিনলে আর কেনাই হবে না। গোটা দুই টাকা আছে সঙ্গে—ওতে হবে না?

রাস্তায় বেরিয়ে সে সযত্নে ছাতাটি খুললো। ধীর, মন্থর, সযত্ন হাব-ভাব, প্রায় মধ্যবয়স্কের মতো। ঝড় পার হ'য়ে সে বুঝি এসে প্রায় পৌঁছলো শান্তির বন্দরে। অতি শান্ত সে, অতি নম্র, প্রস্তুত হ'য়ে আছে মধ্যবয়সের অভ্যাগমের জন্য। চৌত্রিশ হ'লো। ব্যাপারটা কিছুই অদ্ভুত নয়; ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অনেকেরই এটা ঘটেছে বোধ করি। তবু মনে করতে অদ্ভুত লাগে। চল্লিশ হবে, হবে পঞ্চাশ। সেটাও আশ্চর্য নয়, শোকাবহও নয়। যৌবনের জন্য কঁকিয়ে কাঁদবে না সে। বরং ভালোই মনে করবে, যদি তার রক্তের উত্তাপ ক'মে আসে। উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হবে না ক্ষণে-ক্ষণে, উন্মত্ত হ'তে হবে না; জীবনে আসবে শান্তি, আসবে সামঞ্জস্য,

নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতা। আর দুলতে হবে না বাসনায় আর ব্যথায়, স্বপ্নে আর ব্যর্থতায়। ভালোই তো; এ তো প্রার্থনীয়, আশা ক'রে থাকবার মতো। যৌবন গেলো ব'লে সুর ক'রে গোঙাবে না; চাইবে না, চাইবে না দু'হাতে আঁকড়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে। খুসিই হবে। কী গরম!

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে বাস্-এর জন্য সে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখনো সে ভুলতে পারছে না কেন? ভুলে কি যায়নি? গেছে, গেছে। সুমিতার অভাবে জীবন তার কোনোখানেই অসম্পূর্ণ আছে ব'লে সে মনে করতে পারে না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আর্থিক নির্ভাবনায় 'রেস্পেকটেবল' ভদ্রলোকের মতো সে দিন কাটাচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে এ-কল্পনাটা নিতান্তই হাস্যকর। তবু সুমিতার মুখ হঠাৎ এক চকিত মুহূর্তে জ্ব'লে ওঠে তার চোখের সামনে, আর তার সব ভাবনা গুলিয়ে যায়, শান্তি যায় ভেঙে। সে-মুখ সুন্দর। এ-সুন্দর কেমন সে ভেবে পাচ্ছে না। হয়-তো নিজের কাছেও সত্যি কথাটা সে মানছে না। সুমিতা হয়-তো রঙে মাংসে মাপে-জোকেই সুন্দর, আর-কিছু নয়। হেমেন মজুমদারের ছবির মতো, জিগফীল্ড্-বিউটিদের মতো। তবে কি সোমনাথেরই এমন কদর্য রুচি যে ঐরকম স্থূল মাংসল নির্বোধ স্ত্রীলোকেই তার আসক্তি? কিন্তু এই রকম প্রচলিত প্রসিদ্ধ সুন্দরীদের সে-ই তো কত অবজ্ঞা করেছে চিরকাল; যে-মেয়ের রূপের জন্য খুব নাম

তাকে দেখে এই কথাই মনে হয়েছে যে এর মুখের দিকে তাকানো যায় না। তারই মতো অন্য-একজন মানুষের চোখে সুমিতাও হয়তো সেইরকম। কী রোদ! তবু এতক্ষণে একটা বাস্ আসতে পারলো যা হোক্।

সোমনাথ বাস্-এ উঠে বসলো, ধরালো সিগারেট। আসল কথাটা এই যে একবার সে খুব গভীর ক'রেই সুমিতার মোহে পড়েছিলো। সেই মোহ নিয়েই দেখেছিলো তাকে, এখনো ত্থাখে হয়-তো। তার মতো মানুষের পক্ষে এ-মোহটা যে কিছুদিন টিঁকবে, এটাই আশ্চর্য নয় কি? কিন্তু প্রেম নাকি অন্ধ; অন্তত সে যে অন্ধ হয়েছিলো সেটা নিশ্চিত। সেই মোহ বাদ দিয়ে সুমিতাকে দেখতে সে কি কখনোই পারবে না?

কিন্তু কবির চোখে সন্ধ্যার লাল মেঘ যে এত সুন্দর, সেটাও কি একরকমের মোহ নয়? দা ভিঞ্চি কি এক অপরূপ মোহের চোখেই মোনা লিসাকে ত্থাখেননি? সে-মোহের সঙ্গে তার মোহের প্রভেদ কোথায়? যত যুগল বিজয়ী প্রেমের নিশান উড়িয়ে পারস্পরিক পূর্ণতায় জীবন কাটিয়ে গেছে, তারা সকলেই কি দোসরকে খানিকটা মোহ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে নেয়নি? এবং তার মোহটা হাস্যকর মূঢ়তা কি এইজন্যেই নয় যে শেষ পর্যন্ত তার হার হ'লো? সে হেরে গেলো, তাই সে বোকা।

না-হয় প্রশান্তর ওখানে না-ই গেলো আজ। একটা কিছু কিনে চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলেই হবে। ঐ বিজন ঘোষ। স্নায়ু-গুলোকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়বে তো। বিজন ঘোষ তার

সঙ্গে আলাপ করবেই, দেখা হ'লেই করে (সেটা ঈশ্বরের দয়ায় কদাচই হয়), করে বেশ 'অন্তরঙ্গ' সুরেই। 'এই যে সোমনাথবাবু, ভালো আছেন তো ?' গাল-ভরা ভারি-ভারি কথাগুলো স্পষ্ট কানে শুনতে পেলো সোমনাথ। তাকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে কোনো একটা ইডিয়টিক তর্ক তুলবেই বিজন ঘোষ। সে মাথা নেড়ে হুঁ-হাঁ ক'রে যায়, কিন্তু বিজন ঘোষ কিছুতেই তৃপ্ত হবে না যতক্ষণ না সে তাকে বাধ্য করে প্রতিবাদ করতে। আর যদি দৈবাৎ মুখ দিয়ে ও-রকম একটা কথা বেরিয়ে গেলো, তাহ'লেই বিজন ঘোষ ঘোড়ার মতো হা-হা ক'রে হেসে উঠবে, তারপর তাকাবে স্ত্রীর দিকে তার গালের স্ফীত পেশী নাচিয়ে গর্তে-ডোবা চোখ মিটমিট ক'রে। এর চেয়ে বুকের উপর চ'ড়ে রক্ত-পান করাও ভালো।

বিজন ঘোষ প্রতি মুহূর্তেই তার স্ত্রীর কাছে বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র। যেখানে অনেকে উপস্থিত, সেখানে তাকেই যেন খুব বেশি ক'রে চোখে পড়ে সে-চেষ্টায় কোনো বর্বর উপায়ই তার অনায়ত্ত নয়। চোখে তাকেই সব চেয়ে বেশি পড়ে ঠিকই ; সে একটা সেটিতে বসলে আর-একজনের সেখানে বসবার প্রায় জায়গাই থাকে না। ঐ মোটা শরীর দেখেই কি সুমিতা ভুলেছিলো ? সুমিতা কী ক'রে সহ্য করে ওকে ? কিন্তু ও-ই তো সুমিতার নির্বাচিত। কী সূত্রে এসে পড়লো একদিন প্রশান্তদের বাড়িতে। প্রশান্ত তখন বিলেতে। তার অল্প পরেই একদিন কী অনায়াসেই বললে সুমিতা : 'জানো, আমি শিগগিরই বিয়ে করছি ?'

হেসে বলেছিলো সোমনাথ, 'সত্যি নাকি ? কাকে ?'

'বিজন ঘোষকে।'

কথাটা ঠাট্টা মনে ক'রে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলো সোমনাথ। তারপর সুমিতা বলেছিলো : 'হাসছো কেন, সত্যি। মা-বাবার মত হ'য়ে গেছে, দাদা ফিরে এলেই বিয়ে হবে।'

তা-ই হ'লো। কিছু বলতে পারেনি সোমনাথ, কিছু বলতে পারেনি। এ এতই আকস্মিক, আর এতই নিশ্ছিদ্র নির্ভুল। স্পষ্ট বোঝা গেলো, এই এতদিন ধ'রে সুমিতা তার সঙ্গে খেলা করেছে। এমন খেলা কত মেয়েই কত ছেলের সঙ্গে করে— এতে দোষ কী?··· কিন্তু বিজন ঘোষকে যে-মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে, তার সম্বন্ধে কী আর বলবার থাকতে পারে? সুমিতা নিজেকে নিলেমে চড়ালেও পারতো।

সোমনাথ চেষ্টা করেছিলো প্রচণ্ড রাগ করতে, পারেনি। যদি পারতো···যদি পারতো সুমিতাকে ছিনিয়ে কেড়ে আনতে— কিন্তু সে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। এই কলকাতার পথে-পথে কতদিন সে নিরুদ্দেশে ঘুরেছে—কিছু না-ভেবে, কিছু না-ভাববার চেষ্টা ক'রে। মনে হয়েছিলো কত যুগ কত জন্ম ধ'রে সুমিতা তার মনের মধ্যে তিলে-তিলে বেড়ে উঠছে, বুঝি আসছিলো অখণ্ড পূর্ণতার দিন, আসছিলো দুরন্ত বসন্ত সবুজের জোয়ার ডেকে— হঠাৎ এ কী অন্ধকার, এ কী মৃত্যু!

যাক্, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে বোধ করি। জীবনে সুখী

হবার একটিমাত্র সর্ত আছে সুমিতার: টাকা। ধনীর মেয়ে সে। সে যা চেয়েছিলো তা পেয়েছিলো বিজন ঘোষে। তার মন নেই, তার বুদ্ধি নেই, তার আত্মা নেই। শরীর ছাড়া কিছু নেই তার। ও-রকম স্ত্রী নিয়ে কী করতো সোমনাথ? ভালোই হয়েছে, যা অনিবার্য তা-ই হয়েছে। তার ছেলেমেয়ের মা সুমিতা—এটা সহ্য করা কি সম্ভব হ'তো? স্ত্রী আর সন্ততিতে উৎপীড়িত ক্ষীণ নীরক্ত জীবন। প্রেমের মহিমা নয়, প্রেমের ঐশ্বর্য নয়—অতি সাধারণ অতি সঙ্কীর্ণ জীর্ণ দাম্পত্য। হয়-তো তা-ই হ'তো। সে ভেবেছিলো সুমিতা জ্যোতির্ময়ী, সুমিতা সূর্য-কন্যা, আগুনের বন্যা তার বুকে। কেমন ক'রে ও-রকম ভাবতে পেরেছিলো? সুমিতা সত্যি-সত্যি বিজন ঘোষকে বিয়ে করলো, তবে সে বুঝলো তার ভিতরকার চেহারাটা কেমন। বোকা, বোকা।

ভালোই হয়েছে। বাকি জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছে সোমনাথ। সে একা, সে মুক্ত। স্বভাবটাই তার একলাগোছের। অতিশয় কুনো, অতিশয় অমিশুক, তার যৌবনের জীবন-কল্পনায় একটি স্ত্রীর কোনো স্থান ছিলো না। কিন্তু সকলের জীবনেই একবার বুঝি ঝড় আসে, তারও এসেছিলো। উড়ে গিয়েছিলো সে, সব দড়িদড়া ছিঁড়ে উড়ে গিয়েছিলো। রাজি ছিলো মরতেও, কিন্তু মরতে হ'লো না, ফিরে এলো খানিকটা জখম হ'য়ে প্রতিদিনের অভ্যস্ত গর্তে। এখন সব শেষ হয়েছে। ও-রকম বিপ্লব আর আসবে না তার জীবনে। বিয়ে করবার খুব

কাছাকাছি একবারই এসেছিলো, আর তাকে ও-বিষয়ে ভাবতে হবে না। বলতে গেলে কোনো ভাবনাই তার নেই। তার আয় তার পক্ষে যথেষ্ট, এর বেশি চাইবার কোনো উপলক্ষ্যই ঘটে না। পার্থিব উচ্চাশায় পীড়িত নয় সে। সাংসারিকতা সে ঘৃণা করে, সাংসারিকতা তাকে স্পর্শ করলো না। কোনো দায়িত্ব নেই তার, কারো অধিকার নেই তার জীবনে, নিবিড় ও সম্পূর্ণ তার নির্জনতা। সে পড়ে, সে আড্ডা দেয়, ছুটিতে বেড়ায়। জীবন তো নীরস কি অর্থহীন লাগে না : বরং ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। আর অল্পদিন পরেই এমন সময় আসবে যখন লোকে আর তাকে যুবক বলবে না।

এখন আর কিছু বলবার নেই, এখন শান্তি। কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কোনো সংশয় নেই। শান্তি আর নির্জনতা, আর নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতা। শুধু মাঝে-মাঝে সুমিতার মুখ তার মনে পড়ে, যেমন আজ হঠাৎ ক্লাশে বলতে-বলতে মনে পড়েছিলো। কিছু নয় : একটি মুখ, একটি ছবি। যেমন হঠাৎ ঘরের মধ্যে কোনো ছায়া পড়ে, চমকে উঠি। সে-মুখ সুমিতার, কিন্তু সুমিতার নয়। এতদিনে তা হ'য়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক, অনুষঙ্গহীন, সমস্ত পারিপার্শ্বিক থেকে বিছিন্ন, যেন কোনো ছবি দেখে সে ভুলতে পারেনি। যেন কবে কোন্ দেশে সে বেড়াতে গিয়েছিলো, আর কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে একটি ছায়ায় ঢাকা লাল কাঁকরের পথ।

কিন্তু এসে গেছে যে, চৌরঙ্গিতে নামতে হবে সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। বাস্‌টা আবার রওনা হচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি

নেমে পড়লো সোমনাথ। আর-একজন লোক উঠতে গিয়ে তার কোঁচাটা মাড়িয়ে দিলে। ছেঁড়েনি যে এই ভাগ্যি। কোঁচাটা ভরলো পকেটে, রোদের-বান-ডাকা ফুটপাথ দিয়ে ছাতা খুলে চললো। এ-সব রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে বেশ লাগে তার—আকাশের জ্বরের ডিগ্রি একশোর উপরে হ'লেও। খুব হাওয়া দিচ্ছে এখন—গরম হাওয়া, তবু ভালো। চৌরঙ্গির পশ্চিম ধারে কত লাল কৃষ্ণচূড়া। চৌরঙ্গি প্লেসে ঢুকতেই হাওয়াটা যেন থেমে গেলো। সোজা দক্ষিণে হাওয়া। কী কিনবে ছাই ভেবেই পাচ্ছে না; বয়স্ক লোক হ'লে নির্ভাবনায় বই দেয়া যেতো। বাবলিও পড়তে পারে, তার মতো কোনো বই-ই কি নেবে? হিল্যায়ার বেলক্-এর পদ্য—কি সেই মামুলি অ্যালিসের কোনো 'উপহার' সংস্করণ? কিন্তু ও-সব বই বাবলির আছে হয়-তো; তা ছাড়া তার পকেটে দুটোর বেশি টাকা নেই।

ডান দিকে ঘুরে বর্ট্রাম স্ট্রিটে ঢুকেই আবার হাওয়া। রাস্তাটায় ছায়াও আছে, সরু রাস্তা, পশ্চিমে সারি-সারি দোকান। তার চেয়ে নতুন ধরণের কোনো খেলেনা কেনাই ভালো। মার্কেটে পুতুলের দোকানগুলো না কোন্‌দিকে? আন্দাজি একটা দরজা দিয়ে সে ঢুকলো। ভারি ঠাণ্ডা। রোদ্দুরে হেঁটে এসে ঢোকবার মতো জায়গা এই মার্কেট। বাবলির পশু-প্রীতি অসাধারণ, কোনো একটা জানোয়ার হ'লে ভালো হয়। বেশ বড়োসড়ো জানোয়ার, শব্দ করা চাই। একটা হিপ্পো কি গণ্ডার, একটা ক্যাঙারু কি জিরাফ। হিপ্পো কি ডাকে?

পরিক্রমা

একটা মোড় ঘুরতেই দেখা গেলো বরুণাকে। দু'জনেই হাসলো, থমকে দাঁড়ালো।

সোমনাথ বললে : 'আপনি এই রোদ্দুরে বেরিয়েছেন!'

'রোদ্দুরে বেরুনোটাও আপনাদের একচেটে নাকি?'

'বাধ্য হ'য়েই লোকে এই রোদ্দুরে বেরোয়।'

'আমাকে বাধ্য হ'তে হয় না, সুতরাং সখ ক'রেই বেরোতে হয়। অবিশ্যি আজ এ-সব জিনিস আমি না-কিনলে কে এসে কিনতো জানিনে। আপনি কোনদিকে?'

'কিছু একটা কেনবার ইচ্ছে ছিলো বাবলির জন্যে।'

'কী কিনবেন?'

'ভেবে পাচ্ছিনে। পুতুলের দোকানগুলো কোনদিকে জানেন?'

বরুণা বললে : 'চলুন আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।' একটা মুটে ছিলো তার পিছনে, ইসারা করলে তাকে। হাঁটতে-হাঁটতে বললে : 'জিনিস কিনতে আমার বেশ লাগে।'

'আমার ঠিক উল্টো', বললে সোমনাথ। 'দায় সেরে বেরোতে পারলে বাঁচি। ও-হাঙ্গামা জীবনে না-থাকলেই খুসি হতাম।'

বরুণা বলল : 'কতগুলো পরদা আর কুশান কিনলাম। ঠিক যেমন চাই, তেমন মোটে পাওয়া যায় না। তবু—খুব খারাপ হয়নি আশা করি।'

হঠাৎ সোমনাথ বললে : 'আপনার বাড়িতে বিরাট ব্যাপার নাকি আজ?'

'বিনয় ক'রে বলতে হয় অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।'

'কে কে আসবে?'

বরুণা উদাসীনভাবে বললে: 'যে-যে আসে। এই তো আপনার পুতুল।'

দোকানে ঢোকবার আগে সোমনাথ বললে: 'আমার পছন্দ একটা জন্তু। সচল না-হ'লেও চলে, বোবা হ'লে চলবে না।'

কিন্তু দোকানে ঢুকে ঠিক মনের মতো কিছু দেখা গেলো না: মস্ত কাঠের ঘোড়া আছে, আছে পশমের ছোট্ট বাঁদর, নীল কাচের চোখ-বসানো; আর রবারের সাপ, গ্যাটাপারচার গোরু। সোমনাথ মনে-মনে যা ভেবেছিলো সেটা খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু দোকানে দেখতে পেলেই স্পষ্ট হ'তো। দেখতে পেলো না।

সোমনাথ বরুণার দিকে তাকালো।

বরুণা জিজ্ঞেস করলে: 'আর-কিছু নেই?'

দোকানি বললে: 'এই এরোপ্লেনটা নিয়ে যান—ছ'ফুট উঁচুতে ওঠে—'

বরুণা বললে: 'কী নিতে হবে তা আমি জানি। আচ্ছা।' ব'লে উঠে দাঁড়ালো।

সোমনাথ চুপি-চুপি বললে: 'যা হোক্ কিছু নিয়ে যাই। সব দোকানেই তো একরকম।'

বরুণা বললে, 'চলুন ঐ ছোটো দোকানটা দেখি। বিরক্ত হচ্ছেন ঘুরতে?'

সোমনাথ কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'আমিই তো আপনাকে ঘোরাচ্ছি। আপনি হয়তো বাড়ি ফিরছিলেন।'

'পাছে ভুলে যাই, লিষ্টি ক'রে এনেছিলুম। লিষ্টি মাফিক সবই প্রায় কেনা হয়েছে। বাকি আছে ডালমুট, সেটা কিনবো কিনা ভাবছি। ডালমুট একঘেয়ে লাগতে পারে—কী বলেন?'

বলতে-বলতে ঢুকলো দ্বিতীয় দোকানে। দোকানি নানারকম জীব-জন্তু বার করলো; সবই প্রায় আগের দোকানে দেখেছে। কোনোটাই পছন্দ হয় না সোমনাথের, যদিও মুখে সে-কথা বলতে লজ্জা করে। বরুণা চুপি-চুপি বললে: 'উট কি কচ্ছপ ছাড়া কিছু নেবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন নাকি?'

'প্রতিজ্ঞা কিছু করিনি, এবং বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঐ নিতান্ত বৈষ্ণব চেহারার বাঘটাই নিতে হবে। দেখি, দেখি ওটা।'

পিছনের এক কোন থেকে দোকানি একটা জিনিস বার করছিলো, সেদিকে সোমনাথের চোখ গেলো। জিনিসটা যখন তার হাতে এলো দেখেই বললে: 'বাঃ!'

একটা গাধা। দুধের মতো সাদা; মাঝখানে-চেরা কপাল থেকে লেজের ডগাটি পর্যন্ত নিখুঁত। বড়ো-বড়ো শান্ত কালো চোখে যেন গভীর দার্শনিক উদাসীনতা। কান দুটো পানের পাতার মতো চওড়া, লম্বা মুখটা সুখদুঃখের অতীত। তবু কোনো বিষয়েই যে তার চেতনা নেই তা নয়, কেননা ল্যাজটা একটু ম'লে দিলেই গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে—শোনবার মতো ডাক একখানা।

বরুণা দেখে-শুনে বললে: 'এটা পছন্দ হয়েছে আপনার?'

'এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে নিজের জন্যেই নিয়ে যেতে ইচ্ছে

করছে,' সোমনাথ হাসলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'ওর বিষয়েই আজ খানিক আগে ভাবছিলাম।'

বরুণা নিচু হ'য়ে পুতুলটা দেখছিলো; চোখ তুলে বললে: 'কার বিষয়ে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সোমনাথ বললে: 'চমৎকার ডাকটা। কিন্তু জন্মদিনে গাধা উপহার পেয়ে বাবলি কী মনে করবে তা-ই ভাবছি।'

'বাবলি খুসিই হবে।'

'উপহার জিনিসটা গ্রহীতার চেয়ে দাতারই পরিচয়, এই যা সান্ত্বনা', সোমনাথ মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। 'কাগজের একটা লেবেল এঁটে দেবো ভাবছি—methought I was enamoured of an ass। কত দাম এটার?'

দোকানি একবার সোমনাথের একবার বরুণার দিকে তাকিয়ে বললে: 'সাড়ে চার টাকা।'

সোমনাথ গাধাটা একটু নেড়ে-নেড়ে বললে: 'ঐ জলতরঙ্গের বাক্সটা কত?'

'ওটা দেড় টাকা।'

'ভাবছি জলতরঙ্গটাই নেবো কিনা।'

'গাধাটা হঠাৎ অপছন্দ হ'য়ে গেলো?' বরুণা জিজ্ঞেস করলে।

'গাধাটা ঠিক আমারি মনের মতো, তবে দামটা ঠিক—'

'আপনাদের সঙ্গে দরদস্তুর!'

কিন্তু দরদস্তুর ক'রে দামটা সাড়ে তিনটাকায় নামানো গেলো।

ব্যাপার দেখে সোমনাথ গলা নামিয়ে বললে: 'একটা কথা। আমার কাছে ঠিক দুটো টাকা আছে।'

বরুণা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে দোকানিকে দিলে। দু'জনে বেরুলো দোকান থেকে মনে-মনে অত্যন্ত খুসি হ'য়ে—বিশেষ ক'রে সোমনাথ। ডাক বটে একখানা। নির্জলা নির্লজ্জ গাধামি: কোনো ভাণ নেই, কোনো লুকোচুরি নেই। ও-রকম ডাক ছাড়তে পারলে জীবন অনেক সহজ হ'তো, সোমনাথ ভাবলে। কিন্তু আমরা মানুষ, আমরা ও-রকম পারিনে। আমাদের আত্ম-সম্মান আছে।

'বেশ গাধাটা কিনেছেন', বরুণা বললে।

'আমি আর কিনলাম কোথায়? আপনি মিছিমিছি—

'আপনি এখন কোন্‌দিকে?' কথাটা শেষ করতে দিলে না বরুণা।

'এখন বাড়ি যাবো।' কাল সকালে উঠেই বরুণাকে সাড়ে তিনটাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, সোমনাথ ভাবলে। ভুলে না যাই। এই টাকা-পয়সা ব্যাপারটাই ভারি বিশ্রী—নিতে সঙ্কোচ, দিতেও কম সঙ্কোচ নয়।

'আমিও যাই চলুন। ডালমুট আজ আর নেবো না।'

একটু পরে সোমনাথ হঠাৎ বললে: 'দেখুন, একটা কথা।'

বরুণা কথা না-ব'লে তাকালো।

'আজ যদি আপনাদের ওখানে না যাই, খুব কি রাগ করবেন?'

'না, রাগ করবো না। তবে যাবেনই বা না কেন?'

'ভাবছিলাম—'

'আপনার অবিশ্যি ভালো লাগবে না। তবু—আমাদের কোনো ব্যাপারে আপনি অনুপস্থিত এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।'

'আজকের মতো আমাকে যদি মার্জনা করেন', অনুনয়ের সুরে সোমনাথ বললে।

'কথাটা হঠাৎ আপনার মনে হ'লো কেন?'

'হঠাৎ নয়। অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিলাম, অকারণ যন্ত্রণা-ভোগ ক'রে লাভ কী?'

ব'লেই সোমনাথ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। প্রায় কন্‌ফেশনের মতো শোনালো কথাটা। আর এই কন্‌ফেশনের ভাবটাই সে ঘৃণা করে, মানুষের দরদের উপর কুৎসিত জুলুম। তাড়াতাড়ি হেসে বললে: 'আমার একটা রোগ আছে, জানেন, আত্মীয়-ফোবিয়া। এবং এই একটি বিষয়ে আমার আত্ম-পর ভেদ নেই।'

'মানে—নিজের এবং পরের আত্মীয়কে আপনি সমান ভয় করেন?'

'তফাৎ আপাতত শুধু এই দেখছি যে নিজের আত্মীয়কে সম্পূর্ণ এড়ানো যায়, অন্যের আত্মীয়কেই যায় না।'

বরুণা হেসে উঠলো।

'আপনার মনের ভাব যদি এইরকমই তা'হলে না-হয় না-ই

এলেন। কিন্তু আপানার কথার প্রথম অংশ শুনতেও ভালো লাগলো—আমার অভিনন্দন জানবেন।'

'প্রশান্ত ইচ্ছে করলেই সম্পর্কচ্যুত হ'তে পারতো, ইচ্ছে ক'রেই হয়নি। ওর দয়ামায়া বড়ো বেশি।'

'আপনি হ'লে কী করতেন?'

সোমনাথ কোনো জবাব দিলে না। রাস্তায় বেরিয়ে এলো দু'জনে, পিছনে ঝাঁকাওয়ালা মুটে। সেদিকে তাকিয়ে বরুণা বললে: 'অনেকগুলো জিনিস, দেখছি। একটা ট্যাক্সিই নেয়া যাক্। আসুন।' দু'জনে উঠলো একটা ট্যাক্সিতে, ট্যাক্সি ছাড়লো।

হঠাৎ বরুণা বললে, 'কাউকে ঘৃণা করতে বড়ো ঘৃণা করি, কিন্তু এমন-সব মানুষ আছে…যা-ই হোক্, আপনি আসবেন।'

৫

লাঞ্চের পর আপিসের ব্যস্ততার সুরু। কাজের ঘোড়া ছোটে মুখে ফেনা তুলে দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। টেবিলের উপর কেরানিদের মাথা সেই যে আনত হয়, আর সোজা হবার সুযোগই পায় না। টাইপরাইটারের অতি দ্রুত অবিশ্রাম খটাখট শব্দ, গাল রঙ-মাখা ম্লান টাইপিস্ট-মেয়েদের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা এ-কামরা থেকে ও-কামরায়, ঘন-ঘন টেলিফোনের ঘণ্টা, তকমা-আঁটা চাপরাশি বেয়ারার ব্যস্ত ছুটোছুটি, ভিজে খসখস আর ইলেকট্রিক পাখার ছায়াময় স্নিগ্ধতা—বাইরে একশো পাঁচ ডিগ্রি হ'লেও এসে যায় না। বাইরের যানমুখর উদ্‌ভ্রান্তি কখনোই উঠে আসতে পারে না এই তিন-তলায়, উপস্থিত মুহূর্তের কাজ ছাড়া আর-কিছুরই অস্তিত্ব নেই এখানে। বড়োরকমের একটি আপিসের

ভিতরে গেলে জমকালো লাগে বটে, রীতিমতো শ্রদ্ধা হয়। মানুষকে মানুষ ব'লে আর চেনাই যায় না! ব্যক্তিত্ব জিনিসটাই উৎকেন্দ্রিক, তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে কাজের ক্ষতি: এখানে ছাখো এতগুলো মানুষ কেমন নিঃশব্দে পারস্পরিক সহযোগিতার কাজ ক'রে যাচ্ছে—যাকে বলে ডিসিপ্লিন। এখনকার মতো, আলাদা-আলাদা ব্যক্তি নয় তারা, সকলে মিলে একটি বৃহৎ নিপুণ কর্ম-যন্ত্র।

প্রশান্তর কাজ ছাড়া-ছাড়া গোছের, কখনো বিষম চাপ পড়ে কখনো হাতে কিছু থাকে না। খানকয়েক চিঠি সই ক'রে সে একটি বাণিজ্যসংক্রান্ত বিলিতি পত্রিকার পাতা ওন্টাচ্ছে এমন সময় বেয়ারা এলো একখানা কার্ড নিয়ে।

কার্ডটার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে: 'সাবকো সেলাম দেও।' তারপর নেকটাইয়ে একটা টান দিয়ে, মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে গেলো, একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, মনে-মনে প্রস্তুত হ'য়ে নিলে যেন।

স্প্রিঙের আধা-দরজা ঠেলে ঢুকলো বিজন ঘোষ। তার পরনের বিলিতি বেশটা যে অত্যন্তই দামি আনাড়িও সেটা বুঝতে পারে। মস্ত সে, অতিশয় প্রকাণ্ড, এই আপিসের ছোট্ট কামরায় আস্ত একটা হাতির মতো তার আবির্ভাব।

প্রশান্ত বললে, 'বোসো।'

'তোমার কাছে একটু এলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কী খবর?'

'যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে, ভাবলাম তোমাকে একটু দেখে যাই।'

প্রশান্ত হেসে বললে, 'বেশ, বেশ। স্মিতা কেমন আছে?'

'একটু যেন খারাপ হয়েছে ওর শরীরটা, দারজিলিঙে যাবে শিগগিরই বাচ্চাদের নিয়ে। তোমাদের নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।'

'আসছো তো?'

'নিশ্চয়ই।' বিজন ঘোষের গণ্ডদেশে পিণ্ড-পিণ্ড মেদ স্থূল হাসির ভাঁজে-ভাঁজে নেচে উঠলো। 'গ্যাখো, একটা কথা।'

প্রশান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে: 'সেটা শোনবার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

কথাটার মর্ম বিজন ঘোষের মস্তিষ্কে পৌঁছলো না। তেমনি মেদ-মোলায়েমভাবে হেসে বললে: 'তোমার আপিসে একটা চাকরি খালি আছে শুনলাম।'

'তাই নাকি?'

'আছে, খবর পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'খবরটা ভুয়ো নয় ব'লেই বিশ্বাস করি।'

প্রশান্ত আবার বললে: 'তাই নাকি?'

বিজন ঘোষ গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শরীরটাকে যেন আরো একটু ফুলিয়ে তুললো।—'গ্যাখো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'বলো।

'আমার ভাই আছে অনঙ্গ, তাকে চেনো তো?'

'সৌভাগ্য হয়নি।'

'সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছে কমর্সের ডিগ্রি নিয়ে। যদি বলো তাকে তোমার ওখানে নিয়ে যেতে পারি আজ বিকেলে।'

প্রশান্ত জবাব দিলে: 'আজ তো বাবলির জন্মদিন।'

'সে তোমার আপিসে এসেও দেখা করতে পারে। এই চাকরিটা তুমি দেবে তাকে।'

বিজন ঘোষের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রশান্ত আস্তে-আস্তে বললে: 'তুমি যখন আমার উপরিওয়ালার মতোই কথা বলছো, চাকরিটাও তুমিই তাকে দিতে পারবে।'

বিজন ঘোষের গালের উপরে টেনিস্‌বলের মতো গোল হ'য়ে উঠলো মাংসস্তূপ।—'আহা, রাগ করো কেন? তুমি আত্মীয় ব'লেই তো তোমার কাছে এসেছি। আত্মীয় আত্মীয়কে সাহায্য করবে না তো কে করবে?'

প্রশান্ত ঠোঁট গোল ক'রে আস্তে-আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া বার করলে।—'সত্যি, আত্মীয়তা কী অদ্ভুত জিনিস ভেবে ছাখো। যাকে চৌরাস্তায় বেঁধে চাবকাতে ইচ্ছে করে, তাকেও মাঝে-মাঝে খাতির করতে হয়।'

এবারে বিজন ঘোষের হাসিটা এতই সরব হ'লো যে প্রশান্ত চমকে উঠে বললে: 'আস্তে। এখানে নিঃশ্বাসের স্বরে কথা বলবার নিয়ম।'

'I *am* sorry.' বোঝা গেলো, বিলিতি হাবভাবও বিজন ঘোষের একেবারে অনায়ত্ত নয়। 'তোমার কাজের ক্ষতি করছি না তো?' উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রেই আবার বললে: 'চাকরিটা তোমার ডিপার্টমেণ্টে, সুতরাং তোমারই হাতে। আমার ভাইও অযোগ্য নয়।'

'যোগ্য লোক আজকালকার বাজারে শুধু একজনই থাকে না।'

'অনঙ্গর একটা চাকরির বড়ো দরকার।'

'ঠিকই তো। ঠিকই তো। তোমাদের জমিদারির ঠিক আয়টা একলাখ না দেড় লাখ ভুলে যাচ্ছি।'

'কী যে বলো! ঘরের দুটো পয়সা আছে ব'লেই কি ব'সে-ব'সে ওড়াতে হবে? তায় অতগুলো টাকা খরচ ক'রে এলো!'

'ঠিকই তো', মাথা নাড়লে প্রশান্ত।

'একটা-কিছুতে না ঢুকলে পুরুষমানুষকে মানায়ও না।'

'ঠিকই তো।'

'বিশেষ, এ-ব্যাপারটা যখন তোমারই হাতে—'

প্রশান্ত বললে, 'হুঁ।'

'হ্যাঁ—আর-একটা কথা। সুমিতা বলছিলো, পাখির এবারে বিয়ে হ'লে বেশ হয়।'

'ও।'

'অনঙ্গও বলছিলো একটা চাকরি পেলেই বিয়ে করবে।'

'চাকুরে না-হ'লে বুঝি স্বামীত্বের গৌরব থাকে না?'

'পুরুষমানুষের একটা ইণ্ট্রোডাকশন দরকার তো। তা ছাড়া, টাকাটাও তো ফ্যালনা নয়।'

'না, টাকা যত বেশি হয় ততই ভালো।'

'তোমার বোনের পক্ষেও ভালো।'

'উঁ?'

'পাখির কথা বলছিলাম। অনঙ্গর সঙ্গেই ওর বিয়ে হ'তে পারে।'

'তা পারে।'

'তুমি কী বলো?'

টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে প্রশান্ত সেটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। বিজন ঘোষ আবার বললে: 'চাকরিটা হ'য়ে গেলে শিগগিরই বিয়ে হ'তে পারে।'

প্রশান্ত বললে, 'হুঁ।'

'কী, তুমি যে কিছুই বলছো না? আমার কাছেও তোমার বস্‌গিরি খাটাবে নাকি?'

'আমার তো বলবার কিছু নেই। সবই ঠিক হ'য়ে গেছে দেখছি।'

'চাকরিটা ছাড়া।'

'ও, চাকরি। আচ্ছা।'

'আচ্ছা মানে?' বিজন ঘোষের মিটমিটে চোখ ধূর্ততায় হলদে হ'য়ে উঠলো। 'তুমি তো কিছু বলবেই না প্রতিজ্ঞা করেছো, আমি বলি? মল্লিকা যে-ছেলেটাকে বিয়ে করেছে তার জন্যে তুমি এটা ঠিক করেছো। তাই তো?'

প্রশান্ত এত বেশি চমকে উঠলো যে বিজন ঘোষ পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারলে।—'তুমি ভাবছো কী ক'রে জানলাম ?'

'তুমি গোয়েন্দা হ'লে ভালো করতে, বিজন।'

'তাহ'লে সবই বলি। সুমিতা সেদিন গিয়েছিলো মল্লিকার কাছে—'

'সুমিতা গিয়েছিলো ? কেন ?'

'বাঃ, মল্লিকা তো ওরও মামাতো বোন।'

'তা ঠিক।'

'মল্লিকাই বললে যে তুমি ওর—ওর স্বামীর জন্যে চাকরি ঠিক করেছো।'

'মল্লিকা বলেছে এ-কথা ?'

'ঠিক এ-কথা বলেছে কিনা জানিনে, তবে ঐরকমের—'

'এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একবার কথা হয়েছিলো, এর বেশি কিছু ও বলেছে কি ?'

'কথাগুলো ঠিক কী বলেছিলো মল্লিকাই জানে। পরীক্ষা পাশের জন্য পড়া মুখস্থ ক'রে আসিনি।"

ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে চুপ ক'রে রইলো প্রশান্ত।

'তাহ'লে তুমি বলো ঐ কুঙ্কুম ছোকরার জন্যেই তুমি চাকরিটা ঠিক করেছো ?'

'আমি কাউকেই কিছু বলিনি, তোমাকেও বলতে পারিনে।'

'বেশ। বোঝা গেলো। নিজের বোনের চাইতে মামাতো বোনই তোমার আপন হ'লো।'

প্রশান্ত তার ঝকঝকে পালিশ-করা নখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'দেখা যাক, আমিও চেষ্টা করবো। ইচ্ছে করলে তোমার বড়ো সায়েবকেও আমি বাগাতে পারি সেটা মনে রেখো', ব'লে বিজন ঘোষ মুখ লাল ক'রে দাঁড়ালো।

প্রশান্ত হাত তুলে বললে, 'এক মিনিট। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে', বিদ্রূপের চেষ্টা করলে বিজন ঘোষ।

'একটু বোসো। তোমার এই ভাইয়ের কথা একটু জিজ্ঞেস করবো।'

বিজন তৎক্ষণাৎ আবার ব'সে প'ড়ে বললে, 'বেশ তো, যা-যা ...র করো না।'

... ভাই লণ্ডন থেকে শুধু ডিগ্রিই নিয়ে এসেছে?'

'আর আবার কী আনবে?'

'ধরো, কোনো খবর নিয়ে আসেনি?'

'খবর কী-রকম?'

'...ত তোমার সম্বন্ধে কোনো কথা তার কানে পৌঁছ...'

'তুমি কী বলছো।...'

'স্থাখো তো, এ-চিঠিটা বুঝ... প্রশান্ত

তার টেবিলের দেরাজ থেকে একখানা বিলেতি ছাপ-মারা চিঠি বার ক'রে দিলে বিজন ঘোষের হাতে।

চিঠিখানা হাতে ক'রে বিজন বললে, 'কী হবে এটা দিয়ে ?'

'প'ড়ে ছাখো।'

বিজন চিঠিখানা খুলে ধ'রে পড়তে আরম্ভ করলো। পড়তে-পড়তে তার হাত দুটো এত জোরে কাঁপতে লাগলো যে প্রশান্তও তা স্পষ্ট দেখতে গেলো। হঠাৎ তার ঐ মস্ত মেদস্ফীত মুখটা যেন কুঁকড়ে শুকিয়ে ছোট্ট হ'য়ে গেলো।

পড়া শেষ ক'রে সে একবার ঢোঁক গিললো, তার পুরু ঠোঁট দুটো যেন কী কথা বলবার চেষ্টায় কাঁপছে।

প্রশান্ত বললে : 'তোমাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম, তুমি এসে পড়লে, ভালোই হ'লো।'

'এক গ্লাশ জল দিতে পারো ?'

প্রশান্ত বেল্ টিপলো।

'এই রিচার্ড বেণ্টলি কে ?' কঠিন চেষ্টা ক'রে জিজ্ঞেস করলে বিজন।

'লণ্ডনে থাকতে চিনতাম। ইণ্ডিয়ান সিভিল সর্ভিসে আ[illegible] কার্লোতে দেশে গেছে। তোমার জল।'

জল খেয়ে বিজন বললে : 'এর স[illegible] দেখা হয়েছে ?'

'হয়েছে তু' [illegible] শুনে থাকবে কোনো প্রসঙ্গে।'

বিজন ঘোষ চিঠিটার শেষের দিকে আর-একবার চোখ বুলি বললে, 'প্রশান্ত : কী হবে এখন ?'

'কী আবার হবে ? বিগ্যামির জন্য জেলে যাও। তোমার মতো বোকার এই শাস্তিই হওয়া উচিত।'

'মেয়েটা সোজা একবারে চ'লেই এলো—ধ্যাঃ! মাসে-মাসে টাকা তো আমি পাঠাচ্ছিলামই। খামকা কতোই আর পাঠানো যায়, বলো।'

'খামকা! ও তো তোমার স্ত্রী। একটা ছেলেও আছে।'

'ওঃ, ও-রকম স্ত্রী-পুত্র পথে-ঘাটে কত ছড়িয়ে থাকে!'

কথাটা শোনামাত্র ঘৃণার একটা তীব্র বিস্ফোরণে প্রশান্তর সমস্ত শরীর দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে ঘেন্না করে, এই মুহূর্তে ও চ'লে যাক্, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। একটু চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললে : 'ছাখো বিজন ঘোষ, তুমি ইতর তা বরাবর জানি, কিন্তু অমন ইতরের মতো কথা আমার সামনে আর কখনো বোলো না।'

বিজন হাসির ভাণ ক'রে বললে : 'আহা—অত রাগ করছো কেন ? তোমার ঐ বেণ্ট্‌লি সায়েব আমার এই সর্বনাশটা না-করলেও পারতেন।'

'বেণ্ট্‌লি তো কিছু করেনি। মেয়েটাই তার শরণাপন্ন হয়েছিলো—শুনেছিলো সে বাঙলাদেশে থাকে। বেণ্ট্‌লি কিছু অর্থসাহায্য করেছে, আর আমাকে এই চিঠি লিখেছে, এই পর্যন্ত। সামনের শনিবার এসে পৌঁছবে। স্টেশনে যেয়ো আনতে।'

'মেয়েটাকে আসবার বুদ্ধিটা দিলে কে? বেণ্ট্‌লি তো জানে যে আমি এখানে এসে বিয়ে করেছি। এখন কি ঐ লিজিকে মাথায় নিয়ে নাচবো?'

'মামলা হবে—তারপর আইনে যা মীমাংসা হয়। তোমার টাকার পাহাড়ের একটি বড়োসড়ো চূড়ো মেয়েটা যদি খসিয়ে নিতে পারে, আমি তাহ'লে খুসিই হই।'

'তা জানি, তা জানি। হঠাৎ লিজিস্থন্দরীর আমার উপরে যে প্রেম উথলে ওঠেনি সেটা জানি। মৎলব হচ্ছে সশরীরে এসে হৈ-চৈ কেলেঙ্কারি করা, আমার নামটি ডোবানো—আর বেশ কিছু লুটে নিয়ে যাওয়া। আমার টাকার উপরেই সকলের চোখ।'

'তা ছাড়া তোমার আর কী আছে যার উপর লোকের চোখ থাকতে পারে?'

'শুধু কি টাকা—বিশ্রী একটা ব্যাপার হবে না!'

'ও, ব্যাপারটা যে বিশ্রী তা বুঝতে পেরেছো তাহ'লে। তা মেয়েটারও তো একটা গতি হওয়া দরকার।'

'ছোঃ! ও-সব মেয়ের আবার গতি!'

প্রশান্ত এক মুহূর্ত বিজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে: 'যদি তুমি কোনোক্রমে আবার লিজিরই প্রেমে পড়ো তাহ'লে আমার বোন সম্বন্ধেও এই কথাই হয়-তো বলবে। 'ছাখো বিজন, বদ্‌ পাজি লম্পট অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো ঘৃণ্য কাপুরুষ আমি এই প্রথম দেখলুম।'

বিজন অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বললে: 'এখন বিপদে পড়েছি, এই সুযোগে যা পারো ব'লে নাও।'

এক ঝলক রক্ত উঠে এলো প্রশান্তর মুখে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'তুমি যদি আজ ছোটো হ'তে তাহ'লে কিছুই বলতুম না, তুমি ছোটোলোক ব'লে কিছু না-ব'লে পারিনে। যা-ই হোক্, এখন করবে কী?'

'আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি কী বলো?—হ্যাঁ, সব চেয়ে জরুরি কথা এই যে সুমিতার কানে কথাটা যেন না ওঠে।'

কথাটা যে সকল দিক থেকেই সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত মনে-মনে তা বুঝেও প্রশান্ত বললে: 'তোমার যদি সাহস থাকতো, তুমি আজই গিয়ে সুমিতাকে সব বলতে। ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছো, এখন অন্তত পাপক্ষালন করো।'

বিজন ঘোষ মিটমিটে চোখে প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে বললে: 'ত্যাখো, ও-সব কথা ব্রহ্মমন্দিরে গিয়ে বোলো। আপাতত কেলেঙ্কারি থেকে উদ্ধার করো।'

'তোমাকে উদ্ধার করতে আমি ব্যস্ত এটা তুমি ধ'রে নিচ্ছো কেন?'

'আমার লজ্জা কি তোমারও নয়? আমার স্ত্রী তোমারও বোন যে।'

প্রশান্ত অবাক হ'য়ে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইডিয়ট—কিন্তু কিসে তার সাংসারিক সুবিধে সেটা বেশ বুঝে

নিয়েছে। যুক্তিটা অকাট্য তার। মনে-মনে প্রশান্ত বুঝলো যে সত্যি এ নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে লাভ নেই। ব্যাপারটা যেমন ক'রে হোক্ চাপা দিতে হবে, তাকেই সাহায্য করতে হবে সে-চেষ্টায়। তা না-হ'লে সব চেয়ে হাস্যকর করুণার পাত্র যে হবে, সে তারই বোন; এবং রাস্তার লোক যখন সুমিতাকে নিয়ে ঠাট্টার সুরে আহা-উহু করবে, তখন অসহ্য লাগবে তারই। এদিকে বিজন ঘোষকে সে এত তীব্র ঘৃণা করে যে আইনের ও সমাজের কঠোরতম শাস্তি তার উপরে পড়লেও মনে হবে না যে যথেষ্ট হ'লো। আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার যদি কোনো অর্থ থাকে সে তো এইরকম হীন স্বার্থপর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনায়। কিন্তু তা প্রায় কখনোই হয় না; সমাজ আক্রমণ করে তাদেরই যারা সমাজের শ্রেষ্ঠ, অসাধারণত্ব যাদের একমাত্র অপরাধ; পৃথিবীর বিজন ঘোষরা সব সময়ই জমকালো গাড়ি হাঁকিয়ে লোকের মুখে তুড়ি দিয়ে বেড়ায়। এ-ক্ষেত্রেও, বিজন ঘোষের লাম্পট্য কখনোই প্রকাশ পাবে না, সে যে কত বড়ো কদর্য একটা জীব তা যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য প্রশান্তকেই ফন্দি আঁটতে হবে। কেন? না বিজন ঘোষের লাঞ্ছনা আর অপমান লাগবে তার বোনের গায়ে, লাগবে তার পরিবারে, এ থেকে তাদের একটা বৃহৎ দুর্ভোগ আসন্ন হ'তে পারে। তাদের —এই তারা কে? প্রশান্ত নয়, নয় বরুণা, নয় বাবলি। প্রশান্তর তাহ'লে দায় কিসের? কী তার সম্বন্ধ বোনের কি বাপের সঙ্গে? অন্তরের কোনো যোগ নেই। বোনকে সে অতি তুচ্ছ স্ত্রীলোকমাত্র

মনে করে, বাপের মধ্যে স্থাথে আধুনিক পৃথিবীর পিশাচ-শক্তির মূর্তি। তবু—সে তাদেরই। আশ্চর্য নয় কি? এদের কোনো দুর্ঘটনায় অনিচ্ছায় হোক সে জড়িত হবেই, এদের কোনো দুঃখ শেষ পর্যন্ত অতি বাস্তব হ'য়েই তাকে স্পর্শ করবে। যত সভ্যই আমরা হ'য়ে থাকি, প্রশান্ত ভাবলে, বর্বরযুগের গোষ্ঠীগত অভ্যাসগুলি এখনো কাটিয়ে উঠতে ঢের দেরি। তারই জোরে বিজন ঘোষ আজ তার সামনে ব'সে অনায়াসে এমন নির্লজ্জের মতো কথা বলতে পারছে—সে তাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারছে না। আমি তোমার বোনকে বিয়ে করেছি: এ ছাড়া বিজন ঘোষের নিজের সমর্থনে আর-কিছুই বলবার নেই, এবং এ-কথা বলতে যে পারে আর-কিছুই তার বলবার দরকার করে না।

প্রশান্ত হার মেনে বললে: 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো। তুমি এখন যাও।'

বিজন ঘোষের মেদের ভাঁজে-ভাঁজে হাসির রেখা ফুটলো। প্রশান্তর উপর নির্ভর ক'রেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে সে।—'হ্যাঁ, এখন আমি উঠি। কাল তোমার আপিসেই আবার আসবো। স্থাখো হে, ও-সব কিছু নয়। ওয়াইল্ড ওট্স্। অনেকেই ছড়ায়, ধরা পড়লেই মুস্কিল।'

প্রশান্ত নিজের অজান্তেই সাংসারিক স্তরে নেমে এসে বললে: 'চালাক লোক চিহ্ন রাখে না। একেবারে কাগজে সই ক'রে বিয়ে করেছো!'

'সেটাই ভুল হয়েছে। তখন কেমন মায়া হ'লো মেয়েটার উপর—বলা-কওয়া নেই, একটা বেবি বাধিয়ে ব'সে আছে। একটা চেক্ দিয়ে জাহান্নমের রাস্তা দেখিয়ে দিলে ঠিক হ'তো। যা-ই বলো, মানুষটা আমি মোটের উপর ভালোই', ব'লে বিজন ঘোষ দাঁত বার ক'রে হাসলো।

কেমন একটা মানসিক ঝঙ্কারে শিউরে উঠলো প্রশান্ত। বিজনের মুখের দিকে না-তাকিয়ে বললে : 'আচ্ছা, এখন যাও।'

বিজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে : 'মেয়েটার সঙ্গে আমি দেখাও করতে চাইনে—বুঝলে? তোমাকেই একটু কষ্ট করতে হবে। টাকার জন্য ভাবনা নেই।' টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বললে, 'ছাখো তো, এমনিতেই আজকাল টানাটানি, তার উপর এ কী উৎপাত। সোজা দর তো হাঁকবে না। যতটা কমাতে পারো—বুঝলে না?'

'বুঝলাম।' প্রশান্ত অন্যমনে সিগারেট-কেস বার ক'রে বিজনের দিকে বাড়ালো।

বিজন একটু গর্বের ভাবেই বললে : 'আমি স্মোক করিনে, কখনো করিনি, তা কি তুমি ভুলে গেলে?'

'ও, তাও তো বটে। তোমার তো কোনো বদ্‌নেশা নেই', ব'লে প্রশান্ত নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো।

বিজন চ'লে গেলে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রশান্ত মনে-মনে বললে : 'উঃ! কেন যে বাপ-মা থেকে আমাদের জন্ম হয়!' ব'লে টেবিলের বাঁ দিকে বেতের বাস্কেট থেকে কাগজ-পত্র বার ক'রে মন দিলে কাজে।

৬

সুমিতা ধোপার হিসেব লিখছে।

চারটে বাজে। পুরো চারঘণ্টার দিবানিদ্রা থেকে সে জেগে উঠেছে খানিকক্ষণ। মুখ-চোখ এখনো ফোলা-ফোলা। কোঁকড়া কয়েকটা চুল গালে ও কপালে অবিন্যস্ত। সে বসেছে তাদের বাড়ির পিছন দিকের মস্ত বারান্দায়, সেটা পশ্চিম দিক। সেই আপাতত রোদে-পোড়া দিকটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করেছে খস্‌খসের পরদা, একটু আগেই জল দেওয়া হয়েছে, সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বেরিয়েছে আবছা চন্দনের মতো। উত্তর আর দক্ষিণ আছে খোলা; দক্ষিণে তাদের বাড়ির কম্পাউণ্ড, মসৃণ সবুজ ঘাসে ছাওয়া, উত্তরে চোখে পড়ে পাশের তেতলা বাড়ির ব্যাল্কনি থেকে একটা লাল রঙের সাড়ি ঝুলছে। বারান্দার মেঝেটা শুভ্র শীতল

ক্যারারা পাথরের, দেয়ালের গায়ে চৌকো ছাঁচে ইলেক্‌ট্রিক আলো বসানো, চাবি টিপলে আলো হবে, চোখে লাগবে না। তা ছাড়া, নিভাঁজ সাদা চাদরের মতো কংক্রিটের ছাদের মাঝখান থেকে তিন-কোনা শেড-পরানো একগুচ্ছ আলো ঝুলছে, আর ঝুলছে কোনাকুনি দুই দিকে দুটো ভারি অস্‌লার পাখা। তারই একটার নিচে সুমিতা বসেছে একটা অটোমানে। ঐ আসবাবটার আমদানি তুরস্ক থেকে ইয়োরোপে, এবং ইয়োরোপ থেকে আমাদের দেশে। হাত নেই, পিঠ নেই, বসবার আরামটা অগুনতি স্প্রিঙে আর রেশমি বালিশের নির্ভরে। সুমিতার টুকটুকে পা দুটি ঠাণ্ডা মেঝেকে আদর করছে, কোলের উপর চামড়ায় বাঁধানো খাতা রেখে মুখ নিচু ক'রে সে হিসেব লিখছে। তার হাতের পার্কার কলমটার রঙ দুর্লভ সমুদ্রশঙ্খের নিখুঁত অনুকরণে, দাম একুশ টাকা। ফিকে নীল রুল-টানা মোলায়েম কাগজের উপর তার সুশ্রী গোল গোল হস্তাক্ষর অতি অনায়াসেই আঁকা হ'য়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল ভায়োলেট রঙের কালিতে। অনতিদূরে উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে কানে-মাকড়ি-পরা মাথায়-পাগড়ি-আঁটা হিন্দুস্থানি ধোপা মহাবীর অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রের স্তূপ থেকে একটা-একটা ক'রে টেনে নিচ্ছে, আর তার গণনার ফলটা জানাচ্ছে মাইজীকে।

•

যদি এই পৃথিবীকে কেবল চেহারা দিয়েই বিচার হ'তো, তা'হলে কথা ছিলো না। তা'হলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারতুম এই খস্‌খস্‌-সুরভি শীতলতায় অত সুন্দর হ'য়ে ব'সে সুমিতা

পরিক্রমা

সুন্দর একটি কবিতা লিখছে। অতি সুন্দর তার মুখ আরো সুন্দর হয়েছে ঘুম-ভাঙা আলস্যে আর বিস্রস্ত কুন্তলে, আর খাতার উপর ঝুঁকে-পড়া একাগ্রতায়। কবি বলতে আমাদের মনে যে একটি ছবি ফুটে ওঠে এ-মুখ বুঝি সেই ছবির। এই মর্মরের মেঝেতে আর তুরঙ্ক আসনে আর স্বল্প-আনত ভঙ্গির নিবিষ্টতায় যেন কোনো স্বপ্নে-ভরা কবির অলস বিলাসের লীলা। তা-ই হ'লেই মানাতো, তা-ই হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু হওয়া যেটা উচিত, সেটা প্রায়ই হয় না এই পৃথিবীতে। সুমিতার আছে একটি রাইটিং-টেব্‌ল্, ল্যাজারাসের বানানো, দেড়-শো টাকা দাম, দেখবার মতো জিনিস একটা, প্রধানত দ্রষ্টব্য হিসেবেই আছে। সেখানে ব'সে সুমিতা এম্‌বস্‌-করা কাগজে দু' একটা চিঠিপত্র লেখে মাঝে-মাঝে। আর যে-লোকটি সুন্দর কবিতা লেখে, সে লেখে তার একতলার ঘরে বুকে বালিস চেপে তক্তপোষে উপুড় হ'য়ে শুয়ে, মেঝেতে ছড়ানো সেদিনের খবরের কাগজ, দু'ঘণ্টা আগে খাওয়া চায়ের সিগারেটের-ছাই-ফেলা পেয়ালা, গোটা কয়েক ধুলো-মাখা পুরোনো চিঠি আর গোটা দুই রঙ-চটা চামচে—এদিকে সামনের এজমালি উঠোনটুকুতে পাড়ার সাত-আটটি ছেলেমেয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে। এই মুহূর্তে, এই পারিপার্শ্বিকে, ঐরকম সুন্দর মুখ নিয়ে সুমিতার একটি কবিতা লেখাই উচিত ছিলো, কিন্তু তার শঙ্খ-ম্লান কলম থেকে চকচকে বেগ্‌নি কালিতে যে কথাগুলো অত অনায়াসে বেরিয়ে আসছে তা এই :

ধুতি	১৭
সাড়ি	১০
পাঞ্জাবি (সুতি)	৮
„ (সিল্ক)	৪
রুমাল	১৪…

ইত্যাদি। সেমিজ ব্লাউজ বালিসের ওয়াড় বিছানার চাদর জানলার পরদা স্নানের তোয়ালে ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে গ্র্যাণ্ড্‌ টোটাল দাঁড়ালো ৯২ খানা। যোগটা সুমিতা হু'বার করলে, তারপর মহাবীর আর একবার ভাগ-ভাগ ক'রে গুনতি দিলে—সবগুলো একসঙ্গে যখন বাঁধলো সে এক বিরাট ব্যাপার। একটি আস্ত গন্ধমাদন কাঁধে ফেলে তিনবার কুর্নিশ ক'রে পিছনে হেঁটে বিদায় নিলে মহাবীর।

কলম আর খাতা বন্ধ ক'রে সুমিতা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। বিরানব্বুইখানা কাপড়ের হিসেব লেখা নিতান্ত সোজা কাজ নয়। দুই শুভ্র বাহু কাঁধের পিছনে তুলে সুমিতা একবার আড়মোড়া ভাঙলো। এই ভঙ্গিতে তার অচঞ্চল যৌবনের যে ক'টি বাঁকা রেখা ফুটে উঠলো তা দেখে মুগ্ধ হবার মতো কেউ সেখানে নেই, এটাও কম আপশোষের কথা নয়। ক'মাস ধ'রে সুমিতা চেষ্টা করছে ধোপার খরচ কমাতে। বাঙালি মতে এক প্রস্থ, তারপর সায়েবের স্যুটের জন্য (চাকর-বাকরদের সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতারও অভ্যাস হ'য়ে গেছে স্বামীকে অন্যের কাছে এবং নিজের মনে-মনে

'সায়েব' বলা) আলাদা ধোপা, তার উপর দামি সাড়ি আর গরম কাপড়-চোপড় তো আছেই। এক কাপড় ধোয়াবার খরচ মাসে পঞ্চাশটাকা! তা হবেই তো, তা হওয়াই উচিত। তা না হ'লে আর মানুষের পয়সা থাকে কেন? গরিবরাই বা কী খেয়ে বাঁচবে, আর ব্যবসা-বাণিজ্যই বা চলবে কেমন করে? কিন্তু সম্প্রতি সায়েবের কী খেয়াল হয়েছে, খরচ কমাতে হবে। খরচ কমানো কি সোজা, ঈশ্বর যাকে যে-জায়গায় বসিয়েছেন তার সেইরকমই চলতে হবে তো। পুরুষমানুষ থাকবে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে—কী উপায়ে সেগুলো সংঘটিত হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী? তা ঈশ্বরের দয়া এইটুকু যে ওদের মরজিগুলো যেমন বেয়াড়া, ওদেরকে বুঝ দেয়াও তেমনি সোজা। আচ্ছা বেশ। ধোপার উপর দিয়েই কাঁচি ছাঁটার প্রথম কিস্তি। দু' তিনবারে যা কাপড় গেলো তা একবারে গেলেই ঠিক হয়। মহাবীর বললে: 'আমার কাচাটা কি ভালো হচ্ছে না আজকাল?' লজ্জা করে, বাস্তবিক। এই ছোটলোকরা মনে করবে পয়সা বাঁচাচ্ছি এর চেয়ে অসম্মানের কিছু নেই। এ-ধোপটায় হ'লো সুমিতার আত্ম-সম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দারজিলিঙ যাবে শিগ্‌গির, সব কাচিয়ে রাখছে। গরম কাপড়গুলো একদিন বার ক'রে রোদে দিতে হবে। বুলুর ফার-কোটটা কী ক'রে যে পোকায় কাটলো! নিজের জন্য আরো খান দুই শালের সাড়ি না-হ'লেই নয়। এ-সব ব্যবস্থা এক ঘণ্টাতেই করা যায়, এখন দারজিলিঙের বাড়ির খবরটা এলেই হয়।

পরিক্রমা

এবার তারা দারজিলিঙ যাচ্ছে সব-সুদ্ধ, গেলো বছর যায়নি। নন্তুর হাম হ'য়ে গেলো, লক্ষ্মী আর কান্ত সারাটা শীত ব্রোঙ্কাইটিসে ভুগেছে। কেন যে এদের এত অসুখ-বিসুখ করে! তার নিজের শরীরটাও ভালো নেই—কিছু যে হয়েছে তা নয়, তবে মনে হচ্ছে যেন ভালো নেই। সায়েবের ইচ্ছে ছিলো একলা মুসৌরি বেড়িয়ে আসে দিনকয়েকের জন্য, সুস্মিতা সেটা হ'তে দেয়নি। ব্যয়সঙ্কোচ তো এই পর্যন্ত। হাজার টাকা অনায়াসে বেরিয়ে যায়, ধাক্কাটা লাগে ঐ বেচারা মহাবীরের উপর। পুরুষমানুষ এমনি! এই তো অনঙ্গ এলো বিলেত থেকে কুড়ি হাজার টাকা খরচ ক'রে। কুড়ি হাজার টাকা অতিরিক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রাহ্য করবার মতোও কিছু নয়। জনশ্রুতি শুনেছে সায়েবের প্রবাসের ব্যয় ঐ অঙ্কটার অনেক উর্ধে। তা হবেই বা না কেন—গরিবের ছেলের মতো দু' বেলা খেয়ে নানারকম টানা-হেঁচড়া ক'রে কেবল একটা পরীক্ষা পাশ করবার জন্যেই তো যাননি। পয়সা খরচ না-করলে ও-দেশের বড়ো সমাজে মেশা যায় না, আর বড়ো সমাজে মিশতে না-পারলে গিয়ে কী লাভ? ক'টা বাঙালি সাক্ষাৎ ইংরেজ লর্ডপুত্রের সঙ্গে পক্ষীশিকার করেছে! তবে অনঙ্গ অতটা না-করলেও পারতো। আর তাও তো ছাখো, ফিরে এসেও ফিরপোতে খানা খেয়ে বেড়াচ্ছেন, কিছু যে করতে হবে সে-বিষয়ে যেন চৈতন্যই নেই। কিছু না-করলে

এখন ভালো দেখাবে কেন? জিজ্ঞেস করলে রাজা-উজির ছাড়া কথাই বলে না, এদিকে তো মিস্টর বেরিয়েছেন ওর চাকরির তদ্‌বিরে। লজ্জাও করে না। আর দিন-কালও কী বিশ্রী পড়েছে, এত পয়সা খরচ ক'রে এসে দেড়শো টাকার একটা কাজ জোটে না! দেশটা যেন উচ্ছন্নে যাচ্ছে দিন-দিন, কোথাকার কে-কে সব ভালো-ভালো চাকরিতে! মান-সম্মান রেখে চলাই মুস্কিল। দাদারই যে হঠাৎ অন্য লোককে চাকরি দেবার ক্ষমতা হবে, কে ভাবতে পেরেছিলো। ঐ বিধবাটার কপাল আছে, তবে টিঁকলে হয়। আশ্চর্য! পারলে ওরা সত্যি-সত্যি বিয়ে করতে! দাদার একটা নেশা হয়েছিলো—অনেক পুরুষেরই ও-রকম হ'য়ে থাকে—তা দু' চারদিন ফুর্তি ক'রে ছেড়ে দিলেই হ'তো, বিয়ে করা কেন! ছি-ছি, মা-বাবার মনে এত বড়ো কষ্ট দিতে একটু ভাবলে না! অত রূপগুণ, অত ঐশ্বর্য, আর তার কাছে কিনা ঐ পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া বিধবা! দাদা কি চেয়েছিলো —ঐ মেয়েটা এমন ফাঁসই পরালে যে আর ছাড়াতে পারলে না। তা স্ত্রীজাতীয় জীব কাছাকাছি থাকলে পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই···কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস নেই। বাবা যে একটি পয়সাও ওকে দিয়ে যাবেন না, সে-কথাও একবার ভাবলে না। এমন বুদ্ধিভ্রংশ মানুষের কী ক'রে হয়! বাবার উইল হ'য়ে গেছে: আদ্ধেক মায়ের নামে···আর-আদ্ধেক মেয়েদের। মায়ের আদ্ধেকটাও শেষ পর্যন্ত মেয়েদের কাছেই তো আসবে। আর বাড়িগুলো···. কলকাতায়, মিহিজামে, রাঁচিতে···বাড়িগুলোও আছে। বাবা

অবিশ্যি আজকাল দাদার ওখানে যাওয়া-আসা করছেন, কিন্তু ক্ষমা তিনি কখনোই করবেন না। করতে কি পারেন! এখনো দাদা একবার ভাবে না বাবার কথা! দাদার কি আর মনের মধ্যে কিছু না হ'তো, ঐ সর্বনাশী স্ত্রীলোকটাই তো যত বিষ ঢেলেছে ওর মনে। দাদা কত ভালোবাসতো তাদের সবাইকে—সুমিতাকে সব চেয়ে বেশি—সে-সব এখন গেলো কোথায়? না-হয় বিয়েই করেছিলো, তাই ব'লে কি এমনি গাধা ব'নে যেতে হবে! আস্ত একটা পুরুষমানুষ, অত রোজগার করে, অত বিদ্বান, সে কিনা সব সময় হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে তার বৌয়ের মুখের দিকে! বাবার বয়েস হয়েছে, কোন্‌দিন কী হয় ঠিক নেই, এখন ঐ পাখিটার বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। অনঙ্গর সঙ্গে মানাবে ভালো। বাবাকে বলেছিলো সে, বাবা তো খুব খুশি। এত সব জেনেও দাদা কোন্ লজ্জায় অনঙ্গকে চাকরিটা না-দিয়ে পারবে! চাকরি একটা আছে, এবং সেটা হয়তো ঐ কুৎকুৎ ছোকরার ভাগ্যেই ঝুলছে, সেদিন মল্লিকার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুমিতা এ-রকম সন্দেহ করেছে। দাদা যদি এ-কাণ্ড ক'রে বসেন, যদি তাদের সকলকে উপেক্ষা ক'রে একটা ভ্যাগাবণ্ড্‌কে ঐ চাকরিতে বসিয়ে দেন, তাহ'লে লোকের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না। সায়েবকে সে সব বলেছিলো, সেই সঙ্গে সুবুদ্ধিও দিয়েছিলো কিছু। একদিন না-হয় দাদার আপিসেই গেলো। গিয়ে এমনভাবে কথা বলবে যেন সে নিশ্চিত জানে যে চাকরি একটা হাতে আছে, এবং সেটা অনঙ্গরই প্রাপ্য তাও

যেন জানা কথা। হাজার হোক্‌, নিজের আত্মীয়কে ঠেলতে পারে কি কেউ? আপন বোনের স্বার্থ না-দেখে পারে? বাবা আবার গেছেন কোন্‌ দূর দেশে চাকরি নিয়ে—সত্যি, বাবার মতো কর্মিষ্ঠ মানুষ আর দেখলে না!—সেখান থেকে তো আর পাখির বিয়ের চেষ্টা করা যায় না। ছেলে তো সকলকে ভাসিয়েই দিলে—মেয়েদের উপরেই এখন ভার। পাখির বিয়ে হ'লেই এখন বাবার শান্তি—বয়েস হয়েছে, শরীরও ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ যদি কিছু হয়…মা-র কথা হঠাৎ সুমিতার মনে পড়লো। দাদা তো মা-র মুখের দিকেও তাকিয়ে দেখবে না…তা হোক্‌, আমরা তো আছি, সুমিতা ভাবলে। শেষ বয়েসে বৈধব্য তো আর কোনো কষ্ট নয়, টাকাকড়ির কষ্ট না-হ'লেই হ'লো। তা হবার কোনো কারণ নেই অবিশ্যি। অত টাকা দিয়ে মা কী করবেন? বালিগঞ্জের বাড়িটাও তাঁরই থাকবে নিশ্চয়ই? ঐ বিশাল বাড়িতে একা তো তিনি থাকতে পারবেন না: ওটা ভাড়া খাটছে, ভাড়াই খাটবে। মাকে সুমিতাই এনে রাখবে তার কাছে, কোনো কষ্ট হবে না। সুমিতা বড়ো মেয়ে: ছেলের কাজ সে-ই সব করছে ও করবে। 'ও-সব বাড়ি-ঘর দিয়ে এখন আর আমি কী করবো, তোরই রইলো সব', মায়ের এই কথাটা সে স্পষ্ট কানে শুনতে পায়। পাখির যদি এখানে বিয়ে হয়—হবে ব'লেই মনে হচ্ছে—সে তো তারই জন্যে। এই অনঙ্গকে চাকরিটা দেয়া—দাদা কি তাও করবে না? আর-কিছুই করতে হচ্ছে না তাকে, টাকা-পয়সাও দিতে হচ্ছে না, এতে তো তার

কিছু লোকসানও নেই। দাদার একবার এমন কথাও মনে হয় না যে উপযুক্ত সে তো আর কম হয়নি, কিন্তু কারো জন্যেই কিছু করলে না এ-পর্যন্ত। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সায়েবকে আজ আবার দৌড়তে হ'লো আপিসে—দেখা যাক্ কী খবর নিয়ে আসে। তাও এমন নয় যে অনঙ্গ কোনো অংশেই অযোগ্য: বিলেতের ডিগ্রিওয়ালা ছেলে, আর ঐ রাস্তার লোফার! হবে না—লোফার যে-দুষ্কর্মটি করেছেন তা দাদারই লাইনে কিনা—হবে না পছন্দ ওকে! অনঙ্গকে মনে ধরবে কেন—সে তো আর কোনো ভদ্রঘরের মেয়েকে ভাগিয়ে আনেনি, মল্লিকা মেয়েটাই বা কী, মাগো! অনায়াসে আছে দু' জনে একসঙ্গে, লজ্জাও নেই। বিয়ে—চ্ছোঃ, ও আবার একটা বিয়ে নাকি! কুঙ্কুমটার না-হয় তিনকুলে কেউ নেই—পথের কুকুর, উঞ্ছবৃত্তি ক'রে দিন কাটিয়েছে, তবু স্পর্দ্ধাটা কত বড়ো! হবে না স্পর্দ্ধা—ঐ মেয়েটাই তো বদ্। পারলে ও এই কাণ্ডটা করতে, পারলে! খেতে না-পেয়ে শুকিয়ে মরে, তবে ঠিক হয়। এ-সব মেয়ে কেনই বা জন্মায় মা-বাপের বুকে শেল মারতে! আর দাদা দিচ্ছেন এই পাপের প্রশ্রয়। নিজে যা করেছেন করেছেন, সে-সব তো অনেকদিনের কথা হ'লো, এখন লোকে ভুলেও এসেছে। এখন ভদ্রসমাজের মতো চলাফেরা করলেই পারে। টাকা-পয়সা মান-সম্মান হয়েছে, অনায়াসে এখন বড়ো সমাজের একজন হ'তে পারে। তা তো নয়: কারো বাড়িতে যাবে না, ঘরে ব'সে যত সব বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা। ঐ সোমনাথ তার প্রাণের বন্ধু। বয়েস তো

আর কম হ'লো না—এখনো বিয়ে করে না কেন ঐ ভদ্রলোক? কিছু গলদ আছে নিশ্চয়ই। ঐ আর-একজন! চালচুলোর খোঁজ নেই, আর নরকের রাস্তা তো খোলাই আছে। কোন্ দুঃখে বিয়ে করবে! সারাক্ষণ মুখে আছে সিগারেট, লাল জলও চলে, আর সমস্ত রাত তো বাইরেই কাটানো যায়। সবাই তো আর মায়েবের মতো মানুষ নয়—দু'টি বছর বিলেতে কাটিয়ে এলো, একটা সিগারেটে টান দিয়ে ছাখেনি, শেরি-শ্যাম্পেন একটু-আধটু খেতে হয়, নয়তো মান থাকে না। সোমনাথের তো আর মান-সম্মানের বালাই নেই, ও-সমস্ত খায় মাৎলামি করতে, অত পয়সাই বা পায় কোথায়, যা পায় ওড়ায়, ধার করে, আর যা-ই হোক্ বন্ধুভাগ্য তো আছে। সুমিতার ঘোরতর সন্দেহ যে সোমনাথের জন্য তার দাদা যথেষ্ট খরচ করেন। বোকা লোক পেলে অমনি লুটে খায় লোকে। বন্ধুতা তো ভারি—মধু-র ফোঁটা পড়লে অনেক মাছিই উড়ে আসে। দাদার ওখানে রাজ্যের যত অপদার্থ এসেই জোটে—কোথাকার সব ছবি-আঁকিয়ে, গান-গাইয়ে, দু'-পয়সা-চার-পয়সার লিখনেওয়ালা—বৌদি আবার ছবি চিত্রান্ কিনা—স্বামী-স্ত্রী মিলে নবরত্ন সভা সাজিয়ে বসেন—হো-হো হাসি, হা-হা হল্লা—ছি-ছি, ভদ্রলোককে কি এ-সব মানায়! কুঙ্কুম ছোকরাও জুটেছে আর কি এই দলে, পা চেটে-চেটে চাকরিটা বাগানো মৎলব। এই নির্জলা মিথ্যেটা কী ব'লে বললে মল্লিকা—দাদার ওখানে ওরা দু'দিন মাত্র নাকি গিয়েছে! ধন্না দিয়ে রোজ প'ড়ে থাকে কিনা. মুখে তাই লম্বা-চওড়া কথা। হাঁড়ি চড়ে কিনা

ঠিক নেই, এদিকে মান আছে গাড়িবোঝাই! বেশ তো দুঃখে পড়েছিস, বল্‌ সে-কথা খুলে, দয়ামায়া সকলেরই আছে, আমরাও কি আর দু'পাঁচটাকা সাহায্য না করতে পারি! সায়েব ইচ্ছে করলে কোনো আপিসে গোটা পঞ্চাশটাকায় ঢুকিয়েও দিতে পারেন ওকে। তা মানিনী ভাবেই ডুবে আছেন—ও-সব খেয়ালই যেন নেই কিছু। আহা! লোকের যেন চোখ নেই, ওরা কী অবস্থায় আছে তা উনি না বললেই যেন কেউ টের পাবে না। দাদার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতে তো আটকায় না—বড়োলোক ওরা দাদাকেই ঠাউরেছে! সোমনাথও কি আর খামকাই ঘোরাঘুরি করে—গরিব মাষ্টারের ও-সব বড়োমানুষি নেশা তো আর এমনি-এমনি চলে না! সোমনাথ সম্বন্ধে ও-সব কথা তো সকলেই জানে, স্বচক্ষে দেখেছে কত লোক, আর না-দেখলেই বা কী, এ-সব অনুমানেই বোঝা যায়। বিয়ে করেনি, আশে-পাশে কেউ নেই, ও-রকম না-হ'লে আর পুরুষমানুষ কী! কলেজকেও বলিহারি, অমন একটা লোককে চাকরিতে রেখেছে! আর দাদাকে তো কিছু বলাই যাবে না এ-বিষয়ে, তাঁর উৎসাহেই তো এতটা হয়েছে! নিজেও ছিলেন বুঝি ঐ দলেই, এখন বিয়ে ক'রে ডানা-কাটা দেবদূত হয়েছেন। তা বৌও তো ঐরকমই, চোঁ-চোঁ ক'রে বিয়র টানতে নাকি ওস্তাদ। সোমনাথকে খুব পছন্দ, সোমনাথ প্রায় রাত্রেই খাচ্ছে ও-বাড়িতে, খাওয়ার পরে তিনজন সেই যে নানাজাতীয় বোতল নিয়ে বসে, আর ওঠে নাকি রাত একটায়। দাদা বোধ হয় ভাবে কেউ কিছু জানে না, কিন্তু এ-সব

কথা কি আর চাপা থাকে! দাদা নিতান্ত সরল মানুষ—সরল তো নয় বোকা! বোকা না-হ'লে কি আস্কারা দেন সোমনাথকে! বৌয়ের সঙ্গে বন্ধুর ভাব জমিয়েছেন—নিজে তো সারাদিন আপিসেই কাটান—এদিকে বৌ বেড়াতে বেরুলেন ভ্যানিটিব্যাগ ঝুলিয়ে সোমনাথবাবুর সঙ্গে। আহা—আমরাও তো মডার্ন, অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা আমরাও তো নই, তাই ব'লে এ-সমস্ত কী! একদিন হয়-তো দাদার সর্বনাশই হ'য়ে যাবে। যে-মেয়ে ছ' বছর বিধবা থাকবার পর হঠাৎ ও-রকম লুকিয়ে বিয়ে করতে পারলে, অমন দেবতুল্য শ্বশুরের দিকে একবার তাকালে না, তার কি কোনো বিশ্বাস আছে! একটা ঝোঁকে দাদার জন্য ক্ষেপে-ছিলো, আর-একটা যে ঝোঁক হবে না কে জানে! আর সোমনাথ লোকটাও তো সত্যি ভালো নয়—অত বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করেনি, দাদাকে ভাঙিয়ে যেভাবে ওর চলছে, একদিন বন্ধুতার অতি চমৎকার প্রতিদান দিলেই বা মারে কে! চিরকালই তো ওর খানিকটা প্রেমিক ভাব। বিয়ের আগে সুমিতাকে উপলক্ষ্য ক'রেই কাঙালপনা কি আর কম করেছে! তখন সুমিতার মজা লাগতো···এখন বুঝতে শিখেছে, এখন মনে হয় এই ধরণের মানুষ থেকেই কালক্রমে ঘোরতর বিপদ ঘনাতে পারে, কখনো এদের প্রশ্রয় দিতে নেই। দাদার ওখানে মাঝে-মাঝে দেখা হয়—এমন ক'রে হঠাৎ তাকায় সুমিতার দিকে, অসহ্য লাগে তার। হঠাৎ পিঠে একটা চাবুক পড়লে শরীরের যেমন লাগে, তেমনি একটা রোমাঞ্চিত যন্ত্রণা হয় সুমিতার মনে। ও-রকম ক'রে যে তাকায়

সে কখনোই ভালো লোক হ'তে পারে না। দাদাকে সাবধান ক'রে দেয়া দরকার—কিন্তু দাদাকে কিছু বলতে যাওয়া আর সাপের গর্তে হাত দিতে যাওয়া একই কথা। এখনো ওর রাগ গেলো না—সবাই যেন ওর শত্রু, ওর অনিষ্ট করতে সচেষ্ট। সকলের বিরুদ্ধে গেলে কিছু-কিছু শাস্তি পেতেই হয়, তা অত মনে ক'রে রাখবার কী হয়েছে! এখন তো আর কারো মনে কিছু নেই, ওদেরই মন পাওয়া গেলো না। এই বৌদিই অন্যরকম মানুষ হ'লে এতদিনে সব ঠিকঠাক হ'য়ে যেতো—যদিও বাবার মনের ভাব যে বদলাতো সেটা মনে হয় না। তবু—আপন জনের মধ্যে কত কিছুই হয়, আবার ভুলেও যায়, ঐ মেয়েটারই তো বিষের জ্বালা আর ফুরোয় না। সব সময় মাউণ্ট্ এভারেস্টে চ'ড়ে ব'সে আছেন—কাছে এগোয় কার সাধ্যি! বাস্তবিক, এমন ছোটো মন! পেশ্‌কারের মেয়ে তো। অনঙ্গকে আজ নিমন্ত্রণ করলে না তো করলেই না—মাগো, একটু চক্ষুলজ্জাও নেই! আঁখি টেলিফোনে যা বললে—অবাক, সত্যি! বলে কিনা, ও-সব পাতানো কোর্টশিপের জায়গা আমার বাড়ি নয়। তা হবে কেন, যত সব ঢলাঢলি গলাগলির জায়গা কিনা তোমার বাড়ি। ভদ্ররকমের কোর্টশিপ পছন্দ হবে কেন, হাতে ধ'রে খোলা রাস্তায় না নাচলে আর কী হ'লো! পাছে পাখির বিয়ে হ'য়ে যায়, সেই তো আসল কথা! অন্য একজনের ভালো হ'লো—বুক তো ফেটে যাবে। এখন তো আর বিধবা নও যে বিয়ে হ'লে কেঁদে মরবে, নিজের সবই তো আছে—তবু অন্যের সৌভাগ্য সহ্য হয় না!

মানুষ এ-রকমও হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বিয়ে কি আর ওতেই আটকাবে, কোর্টশিপ পাতবার আরো অনেক জায়গা আছে পৃথিবীতে, এ-বিয়ে হবেই। কোর্টশিপ আর কী—বিয়ের আগে আজকাল একটু দেখাশোনার নিয়ম—সেইটা ঘটিয়ে দেয়া। সেটা এমন কিছু শক্ত নয় যে বরুণা দেবী বিরূপ হলেন ব'লেই আর হবে না। কালই সে পাখিকে আনতে পাঠাবে। আনাতে তো কবেই পারতো, কিন্তু ঐ মেয়েকে সব সময় চোখে-চোখে রাখবার হাঙ্গামাটাই কি কম! অনঙ্গও এ-বাড়িতে; বিয়ের প্রসঙ্গ দু' জনেরই কানে পৌঁচেছে, আর বাড়িটাও এত বড়ো আর নির্জন! বাস্তবিক, এই মেয়ে জাতটাকে নিয়ে জ্বালার আর শেষ নেই।

এমনি ভাবছিলো সুমিতা, সেই খস্‌খস্‌-সুরভি হাওয়ায়, টুক্‌টুকে দুটি পা মার্বেলের ঠাণ্ডা মেঝেতে রেখে, অমন সুন্দর শরীরের একটি অপরূপ ভঙ্গিতে রেশমে মোড়া অটোমানে ব'সে সেই পড়ন্ত বিকেলে।

এমন সময় এলো বিজন। পিছনে এলো শোফার, কতগুলো সওদা হাতে ক'রে। সেগুলো বারন্দার মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিলে রেখে চ'লে গেলো সে। সিঁড়ি ওঠার ক্লান্তিতে হাঁপাতে-হাঁপাতে স্ফীত আরক্ত বিজন ব'সে পড়লো একটা ইজি-চেয়ারে। সুমিতা বসবার ভঙ্গিটা ঈষৎ বদ্‌লে স্বামীর দিকে একবার তাকালো।

পরিক্রমা

বিশাল বাড়ির কোন গোপন কোন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো এক বোয়। হাতে তার সবুজ কার্পেটের চটি আর অতি মিহি ক'রে কুঁচোনো একটা ঢাকাই ধুতি। ব'সে পড়লো সে প্রভুর পদতলে হাঁটু গেড়ে, দ্রুত আঙুলে খুললো জুতো আর মোজা, তারপর খুলে নিলে গায়ের কোট, গলার টাই আর কলার—বিজন শরীরটাকে প্রায়োজন মত ঈষৎ সঞ্চালিত ক'রে তাকে সাহায্য করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শিথিল পাৎলুনের উপর দিয়ে ধুতিটা লুঙ্গির মতো ক'রে জড়িয়েই ফের ব'সে পড়লো, বোয় টেনে বার ক'রে নিলে পাৎলুন, তারপর সবগুলো পরিচ্ছদ দু' হাতে সংগ্রহ ক'রে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

হাত-কাটা পিঠ-কাটা বিলিতি গেঞ্জি আর হাঁটুর কাছে উঠে-আসা ঢাকাই ধুতি প'রে পরিশ্রান্ত বিজন ঘোষ বিশ্রাম করতে লাগলো।

গদি-আঁটা প্রশস্ত ইজি-চেয়ারে শরীরটা অর্দ্ধশায়িত, গোল-গোল থামের মতো পা দুটো ছড়িয়ে দেয়া, পাৎলা ধুতির অন্তরাল থেকে একটি সুগোল বাচ্চা ভুঁড়ি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-পড়া করছে।

খানিক পরে সুমিতা জিজ্ঞেস করলে, 'ওগুলোতে কী আনলে?'

'প্রশান্তর মেয়ের জন্য গোটাকয়েক ফ্রক্ এনেছি—আজ কিছু নিয়ে যেতে হবে তো।'

'ও, ফ্রক।' সুমিতা নির্জীবভাবে বললে।

'ফ্রেঞ্চ সিল্কের—আধ ডজন ষোলো টাকা নিলে। আরো বেশি দামের আনা উচিত ছিলো কি?'

'না, না—আর কত দামের আনবে। এত দামেরই বা আনলে কেন?' শেষের কথাটা ব'লে সুমিতা প্রমাণ করলো যে ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব সম্বন্ধে সে একেবারে অনবহিত নয়।

'বাঃ, তোমারই অল্প দামের কোনো জিনিস পছন্দ হয় না, আর তুমিই এখন এ-কথা বলছো!' বিজনের কথাটায় একটু উষ্মা ছিলো, উষ্মার কারণও ছিলো। বাবলির জন্মদিনের উপহারে চার-পাঁচটাকার বেশি খরচ করবার ইচ্ছে তার ছিলো না; কিন্তু পাছে সুমিতার ওটা মনঃপূত না হয়, সেই ভয়ে সে ধাঁ ক'রে একেবারে ষোলো টাকাই খরচ ক'রে এসেছে। স্ত্রী কোনো কারণেই অপ্রসন্ন থাকেন, আপাতত বিজন ঘোষ এটা একেবারেই চায় না। বরঞ্চ তাকে খুসি রাখবার জন্যে সে এই ধরণের ছোটোখাটো আত্মত্যাগ পর্যন্ত করতে রাজি। তাতেও যদি উল্টো ফল হয়, মেজাজটা একটু খারাপ তো হ'তেই পারে।

'আজ ওর বিয়ে কাল ওর জন্মদিন তো লেগেই আছে', তার সুন্দর রক্তিম ঠোঁট ঈষৎ বাঁকিয়ে সুমিতা বললে। 'সব সময় দামি-দামি জিনিস দিতে গেলে চলে কি! ষোলো টাকা সোজা তো নয়।'

'তবে এক কাজ করো না! গোটা দুই ফ্রক্ দাও বাবলিকে, —আর গুলো রেখে দাও, শিগগিরই আর কারো জন্মদিন কি না পড়বে!'

কিন্তু কথাটা সুমিতার পছন্দ হ'লো না।

'দরকার নেই, বাপু—কিনে ফেলেছো যখন ও দিয়েই দাও। আঁখি আবার ঘটা ক'রে কী নিয়ে আসে কে জানে। ওর তো আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি আছে।'

একটু পরে বিজন বললে: 'তুমি সেই শালের শাড়ির কথা বলেছিলে—'

'হ্যাঁ, কালকেই যেতে হবে জেঠমলের ওখানে।'

'—আমি নিয়ে এসেছি।'

'ও, এনেছো।'

'দুটো এনেছি। একটা ক্রীম, একটা ওয়াইন।'

সুমিতা বললে: 'হুঁ।'

বিজন একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে: 'আর জেঠমল একখানা মাইসোরের জরজেট জোর ক'রেই গছিয়ে দিলে। পঞ্চাশটাকা দাম—সাচ্চা জরির পাড়। আমার চোখে তো মন্দ লাগলো না, এখন তোমার পছন্দ। যদি ইচ্ছে করো আজ ওখানা প'রে যেতে পারো।'

সুমিতা প্যাকেটগুলো খুললো না, উঠে গিয়ে একবার ছুঁয়েও দেখলে না। যেমন ছিলো তেমনি ব'সে রইলো। একটু পরে বললে: 'আজকাল কাপড়চোপড় প'রেই কি কোনো সুখ আছে!. জাপানি জরজেট বেরিয়েছে—সকলেই ফ্যাশনেবল।'

বিজন একটু ভেবে বললে: 'তা বটে।'

'কোন্‌টা আট টাকা আর কোনটা পঞ্চাশটাকা ব'লে না-দিলে

ক'টা লোকই বা বুঝতে পারে!' পৃথিবীর মানুষের নির্বুদ্ধিতায় পীড়িত হ'য়ে সুমিতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'বোঝাবার একমাত্র উপায় দামের টিকিটটা আঁচলে ঝুলিয়ে রাখা', ব'লে হা-হা ক'রে হেসে উঠলো বিজন ঘোষ। হাসলো বটে, কিন্তু এ-রকম কোনো ব্যবস্থা সভ্যসমাজে প্রচলিত নেই ব'লে মনে-মনে একটু দুঃখিতও হ'লো।

উর্দি-পরা ভৃত্য রূপোর ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে এলো। ট্রেটা রাখলো বিজন আর সুমিতার মাঝখানে একটা টিপয়ে, ই-পি-এন্-এস্-এর টি-পট থেকে অভিনব আধুনিক ছাঁচের ঝকঝকে পেয়ালায় ঢাললো সোনালি সুরভি চা। চা ঢেলে দিয়ে গেলো পরদাটা তুলতে—এতক্ষণে রোদ অনেকটা পড়েছে—সমস্তটা তুলে রোদের মাত্রা দেখে আবার আদ্ধেকটা নামিয়ে দিল।

অতি সুকুমার, অতি সুশ্রী, অতিশয় কমনীয় ধরণে সুমিতা দু' আঙুলে চায়ের বাটি তুলে নিঃশব্দে ছোট্ট এক চুমুক পান করলো।

দুই খণ্ড স্যাণ্ড্উইচ একসঙ্গে মুখে পুরে চা সহযোগে সেটা গলা দিয়ে নামাতে-নামাতে বিজন বললে: 'ম্যুনিসিপাল মার্কেটে আজ একটা দৃশ্য দেখলাম।'

স্বল্প উত্থিত হ'লো সুমিতার ভুরু।

'আমাদের বরুণা দেবী, আর তোমার দাদার ঐ বন্ধু—কী না নাম—দু'জনে একসঙ্গে ব'সে আছেন এক পুতুলের দোকানে।' খাদ্যসংযোগে স্ফীততরো বিজনের গালে খণ্ড-খণ্ড মেদ অশ্লীল উল্লাসে নৃত্য ক'রে উঠলো।

'এ আর নতুন কথা কী', উদাসীনভাবে বললে সুমিতা।

'এ-বিষয়ে সুমিতার সঙ্গে বিজন যে সম্পূর্ণই একমত, সে-ভাবটা ফুটলো তার কানে-কানে-টানা বিহ্বলগোছের হাসিতে। পর-পর তিন চুমুক চা খেয়ে বললে, 'না—এমনি বলছিলুম। আমি যেতে-যেতে দু' তিনবার ওদের দিকে তাকালাম—তা ওদের মুখ তোলবার ফুরসৎই নেই—পাশাপাশি ব'সে কী-একটা জিনিস দেখছে।'

'এ-সব তো জানা কথাই', সুমিতা তার প্রথম মন্তব্যটাকেই একটু ঘুরিয়ে বললে।

'বাস্তবিক!' বিজন সাহস ক'রে এর বেশি কিছু বললো না, নিজের মনের কথাগুলো স্ত্রীর মুখ থেকে শোনবার আশা করতে লাগলো।

কিন্তু সুমিতা বললে অন্য কথা: 'দাদার আপিসে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।'

একটু অপেক্ষা ক'রে সুমিতা জিজ্ঞেস করলে: 'কী হ'লো?'

'হবে আবার কী! কিচ্ছু না!'

'মুখের উপর না ব'লে দিলে?'

'ঠিক না বলেনি, তবে বোঝা গেলো। তোমার দাদা ঐ কুঙ্কুমকেই তার আপিসে না বসিয়েছে তো কী বললাম!

'হুঁ।'

'হবে না! বর্ড্স্ অব দি সেম ফ্লক!'

'এ তো জানা কথাই।' সুমিতার সর্বজ্ঞতা দেবতুল্য হ'য়ে উঠতে লাগলো।

'আমি তো কত ক'রে বোঝালাম—তা ওর কাছে তো আর ীয়তার কোনো মূল্য নেই। নিজের বোনের চাইতে কিনা মামাতো বোন বড়ো হ'লো—তাও মামা যদি নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে না-উঠতেন তাহ'লেও হ'তো। ধন্য দাদা তোমার!'

'তুমি যে বলেছিলে বড়ো সায়েবকে ধ'রে—'

'দেখবো চেষ্টা ক'রে। হ'লে পরে প্রশান্ত আচ্ছা একটা কান-মলা খায়। কিন্তু হবে ব'লে মনে হয় না। ওরই ডিপার্টমেন্ট কিনা—ওর কথাই প্রায় শেষ কথা। দৈবক্রমে বড়ো কিছু হ'য়ে গেলে এক-একটা লোক কী যে মনে করে নিজেকে! আমি নিজে গিয়ে একটা কথা বললাম, সেটা ওঁর গায়েই লাগলো না! আচ্ছা দেখা যাক্, ঈশ্বর এমন কি কোনোদিন করবেন না যে ঐ প্রশান্তকেই কোনো কারণে আমার কাছে এসে দাঁড়াতে হবে!'

প্রার্থনা যত প্রবলই হোক্, ঈশ্বর হয়তো সেটা মঞ্জুর করতে ভুলে যাবেন, এ-রকম একটা সন্দেহ বিজন ঘোষের নিজেরই মনে। সেই জন্যই আরো জোর দিয়ে সে বললে: 'এ-রকম যার স্বভাব তার কি কখনো সুখ হ'তে পারে! উড়নচণ্ডী উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী—ওর অধঃপাত তো এমনিই হ'তো, তার উপর কতগুলো বিশ্রী বিলিতি বই গিলে মাথাটা আরো খারাপ হয়েছে। যাবে, সব যাবে ওর, ভিক্ষে করতে বেরুতে হবে। সেই যে প্রণয়িনীকে নিয়ে উপোস ক'রে কাটাতে হ'তো সে-কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছে।'

সুমিতা বললে, 'পারো না তুমি অনঙ্গকে ঐ আপিসেই ঢোকাতে ?'

'দেখি !' বিজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ অনেকটা নেমে এলো।

'কত সাব-সুবোর সঙ্গে তো খানা খাও, আর কাজের বেলায় এটুকু পারো না।'

'ও-সব লোককে দিয়ে কিছু কবুল করানোই মুস্কিল যে', বিজন সতর্কভাবে বললে। সেদিন এমনি এক উত্তেজনার মুহূর্তে সে স্ত্রীর কাছে ব'লে ফেলেছিলো যে ইয়োরোপীয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার অতিশয় সুহৃদভাব, এবং প্রশান্তর সঙ্গে আজকের আলাপের সময়ও তার জেরটা মুখে না-ফুটলেও মনে-মনে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ এক নির্মম মুহূর্তে সে আবিষ্কার করলে যে উক্ত ভদ্রলোকটি কে, তাঁর নাম কী, নিবাস কোথায় ইত্যাদি সৌহার্দ্যের প্রাথমিক তথ্যগুলিই তার অজ্ঞাত। সুতরাং প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলতে লাগলো : 'ত্যাখো, ও-সব মামাতো বোন-টোনও কিছু নয়—আসল কথা, ঐরকম একটা বীরত্বের কাজ করেছে কিনা, সেটাই পছন্দ হয়েছে। ঠিক ওঁরই একজন জুড়ি মিললো তো! তা পথে-ঘাটে তো কত বদ ছোকরাই ঘুরে বেড়ায়—একজনকে ধ'রে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেই হয়।'

সুমিতা বললে : 'হুঁ।'

'যাকৃগে, অনঙ্গর চাকরি তো একটা হবেই—এতগুলো টাকা খরচ ক'রে বিলেতি ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, ও আর ফ্যাল্না যাবে

না। তা ছাড়া, প্রশান্তর মতো ঐ চাকরিটুকুই তো আর সম্বল নয়।' বিজন আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছুঁচলো শব্দ ক'রে হেসে উঠলো।

সুমিতা বললে: 'বাবার চিঠি পেলাম আজ।'

'তোমার বাবা—ও!'

'লিখেছেন: বিয়ে যদি হয়ই তাহ'লে আর দেরি ক'রে লাভ নেই।'

'ও, পাখির কথা। তা হোক্ না। অবিশ্যি চাকরি পেয়ে বিয়ে করাই ভালো মনে করি—এই তো এতগুলো টাকা খরচ ক'রে এলো—'

'অনঙ্গর তো চাকরিটুকুই সম্বল নয়।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা বেশ তো, তা—'

'পাখিকে আমি দারজিলিঙে নিয়ে যেতে চাই।'

'কেন?' নিছক অভ্যেসের দোষে বিজন ব'লে ফেললো।

'অনঙ্গও যাবে দিনকয়েকের জন্য। হাজার হোক্, আজকালকার ছেলেমেয়ে তো, একটু দেখাশোনা না-হ'লে চলবে কেন? ভালো দেখায়ও না সেটা।'

নিজের অতীতের কথা ভেবে বিজন বললে: 'ঠিকই তো।' সুমিতার বাপ তাকে পাকড়ানোর কাজটা শেষ ক'রে তারপর উপস্থিত করেছিলেন কন্যার সামনে। কন্যার রূপের সুখ্যাতি বিজন আগেই শুনেছিলো, দেখে যথারীতি মুগ্ধ হ'লো। তারপর।'

'ঠিকই তো', একটু বিশেষ জোর দিয়ে বিজন আবার

বললে। 'আমাদেরও তো লভ-ম্যারেজ হয়েছিলো।' সগর্বে বললে কথাটা। কেউ বলতে পারবে না সে সেকেলে। 'তা পাখি তো এখানেও—'

'দারজিলিঙই ভালো', সুমিতা বললে। 'অন্যের ঘরের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার লোকের অভাব তো নেই কলকাতায়। কোনো-একটা ছুতো পেলেই হ'লো! এ-সব আপদ দারজিলিঙে নেই।'

বিজন তৃতীয়বার বললে, 'ঠিক কথা।'

'অনঙ্গর কাছে সেদিন কথাটা পেড়েছিলুম। বলে, এখন বিয়ে করবো না। তা দারজিলিঙে গিয়ে সাতদিন পরেই অন্যরকম বলবে। দু' জনকে সাবধানমতো একটু নিরিবিলি থাকতে দিলেই হবে। বোনেদের মধ্যে পাখিই সব চেয়ে সুন্দর অনেকের মতে।'

'পাগল! তোমার চেয়েও!' বিজন তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করলো।

সুমিতা ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে।—'ভেবেছিলুম দাদার ওখানে আজ পরিচয়টা ঘটাবো, কিন্তু বৌদি অনঙ্গকে নিমন্ত্রণ করতে রাজি হ'লেন না।'

খবরটা বিজন জানতো না, শুনে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থা থেকে তড়াক ক'রে উঠে বসলো সোজা হ'য়ে।

'তুমি নিজে বলেছিলে?'

'আঁখিকে দিয়ে বলিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণ আর কী—ওরা বললে নিয়ে যেতুম অনঙ্গকে।'

বিজনের অতি ক্ষুদ্র চোখে একটা বিষাক্ত হলদে রঙ ঝিল্‌কিয়ে উঠলো।—'কী বললেন বরুণা দেবী?'

'বললেন, তোমাদের এই পাতানো কোর্টশিপের নাটকে আমি কোনো পার্ট নিতে পারবো না।'

'সে তো ঠিকই, যে-সব নাটকে যে-রকমের পার্ট নিয়ে তাঁর অভ্যেস, তার তুলনায়' এ তো নিতান্ত জোলো লাগবেই। বন্ধুদ্বয়ের মদের সভায় সাকীর পার্ট প্লে ক'রে অভ্যেস কিনা, এর চাইতে খোলাখুলি একটা মেয়েমানুষ রাখলেই হয় চাঁদা ক'রে! বিয়ের ভড়ংএর দরকার কী? মেয়েটাকে নিয়ে তো শুনেছিলাম বন্ধুবিচ্ছেদ হয়-হয়। তারপর আপোষে মীমাংসা হ'লো, বিয়েটা প্রশান্তবাবুই করলেন, সোমনাথেরও অংশ রইলো। তবে যে-রকম ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে, ঐ গরিব মাষ্টারই কেড়ে নিলো ব'লে, ডট্‌সাব তখন ফ্যা-ফ্যা করবেন। প্রায়ই তো বরুণা সোমনাথকে একসঙ্গে দেখা যায় সিনেমায়।'

'তাই নাকি?'

'পুলিন তো সেদিনও দেখে এলো! প্রশান্তটাই বা কী-রকমের পুরুষমানুষ! কেনই বা ভ্রূক্ষেপ থাকবে—নিজেও তো প্রেমিক পুরুষ কম নন। শেষটায়, দেখো, এই দুই কুকুরে কামড়া-কামড়ি করবে। ছি-ছি, একে আবার বিয়ে বলে!'

যে-কথাটা বলা হ'লো না অথচ খুব স্পষ্ট ক'রেই বলা হ'লো তা অবিশ্যি এই যে তার ও সুমিতার বিয়েটা হচ্ছে আদর্শ বিবাহ, এবং সুমিতাও যেন কথাটা না ভোলে। এই তাদের সাত বছরের

পরিক্রমা

বিবাহিত জীবনে বিজন ঘোষ যে নীরন্ধ্র স্ত্রী-ভক্তির পরিচয় দিয়েছে—

তারপর হঠাৎ তার মনে পড়লো যে লিজি আসছে সামনের রবিবার।

উর্দি-পরা ভৃত্য খসখসের পরদাটা সম্পূর্ণ তুলে দিলে, বারান্দাটা পড়ন্ত আলোর আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। যথাসময় বুঝে প্রভুর সামনে রূপোর ডিবেয় স্তূপীকৃত পান রেখে সে গেলো চ'লে।

বিজন আর-কিছু ভেবে-না-পেয়ে একসঙ্গে গোটা চারেক পান মুখে ফেলে চিবোতে লাগলো। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো বুলু। ছ' বছরের মেয়ে। গোলাপি রঙের একটা সাটিনের জামা পরনে, ভালো চুল উঠবে ব'লে কিছুদিন আগে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, এতদিনে মাথাটা ভালো ক'রে ঢেকেছে। রঙটা অত্যন্ত ফর্সা, মুখের ভাবটা নির্বোধ। ঠিক সেই চেহারার মেয়ে, তেরোয় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে অসামান্য সুন্দরী ব'লে বঙ্গদেশে যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

মেয়েকে দেখবার সঙ্গে-সঙ্গে বিজন ঘোষের মুখের ভাবটা অতিশয় গম্ভীর হ'য়ে গেলো। খুব একটা কড়া সুরে ডাকলো, 'বুলু!'

ভয়ে-ভয়ে বুলু কয়েক পা এগিয়ে এলো।

'তুমি আজ বেড়াতে যাওনি যে?'

'যাইনি, বাবা।'

'কেন যাওনি?'

'রমার সঙ্গে খেলছিলাম।'

'তোমাকে আমি বলিনি রোজ আয়ার সঙ্গে বেড়াতে যাবে—লক্ষ্মীদের নিয়ে যখন যায়।'

বুলু ঢোঁক গিললো, কোনো কথা ফুটলো না।

সুমিতা বললে: 'আহা—ও এখন বড়ো হয়েছে না, এখন কি আর আয়ার সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগে।'

এবার বিজনের ঢোঁক গেলবার পালা। স্বরটা একটু মৃদু ক'রে বললে: 'ওর তো কত কিছুই ভালো লাগবে না, জোর ক'রে করাতে হবে।'

বুলু আড়চোখে দু' জনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো যে মা-র যখন অন্যরকম মত, তখন অপরাধটা তার খুব বেশি হয়নি। একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে: 'মা, একটু চা খাবো।'

'না, ভারি বদ্‌স্বভাব হয়েছে তোমার—রোজ বিকেলে চা খেতে চাওয়া। কক্ষনো পাবে না।' চায়ের বাসনগুলোর দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে বুলু চ'লে যাচ্ছিলো, সুমিতা ডাকলো, 'শোনো।'

অতি অনিচ্ছাতেই বুলু থমকে দাঁড়ালো। সে যাচ্ছিলো রান্নাঘর অঞ্চলে, সেখানে এতক্ষণে চাকরদের চায়ের মজলিশ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। সেখানেই তো রোজ বিকেলে চা খায় সে। আজ সাহস ক'রে মা-র কাছে চাইতে এসেছিলো, শিক্ষা হ'লো, আর আসবে না। বিজন টী-পটের ঢাকনাটা তুলে একবার উঁকি দিয়ে বললে: 'থাক্ না একটু।'

'না, না, ক্ষেপেছো! ঐটুকু মেয়ে, ওর চা খাবার কী হয়েছে!'

উপযুক্ত সময় বুঝে কোথা থেকে সেই ভৃত্য আবির্ভূত হ'য়ে চায়ের বাসনগুলো তুলে নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

সুমিতা বললে: 'বুলু, তুমি আর নন্তু আজ আমাদের সঙ্গে যাবে—মামার ওখানে।'

'কেন, মা?'

'বাবলির আজ জন্মদিন কিনা।'

'লক্ষ্মী আর কান্তু কী করবে?'

'তারা বাড়িতে থাকবে।'

'আমিও থাকবো, মা, ওদের সঙ্গে।' বুলু উৎসুখ চোখে মা-র দিকে তাকালো। না-যেতে পারলে সে বেঁচে যায়। গেলে পরেই তো নাচতে গাইতে হবে—রিসাইট করতেই যে হবে না তাই কি কেউ বলতে পারে! ভাবতে বুলুর সমস্ত শরীর কাঠ হ'য়ে এলো।

'না, না, তোমাকে যেতে হবে', সুমিতা সংক্ষেপে বললে। 'এখন আবার কোথাও যেয়ো না কিন্তু—নন্তু কোথায়?'

'নিচে।'

'আমি আসছি এক্ষুনি তোমাদের দু'জনকে সাজিয়ে দেবো।'

'মা!'

'কী হয়েছে?'

কিন্তু বুলু আর আপত্তি জানাতে সাহস পেলো না। সে বুঝে নিয়েছে যে কিছুতেই আর ছাড়া পাবে না।

'বুলু, তোমার ঐ নাচটা একবার দেখাও তো।'

বুলু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, তার ঠোঁট একটু-একটু কাঁপছে।

'সেই যে—"চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে।" এই তো সেদিন এটা শিখে এলে। নাচো।'

বুলুর দিক থেকে কোনোরকম সাড়া-শব্দ এলো না।

'এটা আজ বাব্‌লিদের ওখানে তুমি নাচবে। কী, কথা শুনতে পাচ্ছো না?"

'এখন না, মা—'

'এখন নয় তো কখন্ আর! বাড়িতে একবার প্র্যাকটিস না-করলে চলে! ওখানে গিয়ে সব ভুলে-টুলে বোকার মতো খাবি খাবে—না?'

'অবাধ্যপনা কোরো না', হঠাৎ গর্জে উঠলো বিজন।

'অমন ক'রে ধমকাও কেন? আরম্ভ করো, বুলু।'

অগত্যা বুলু অত্যন্ত মিহি স্বরে কাটা-ছাঁটা সুরে গান ধরলো,

'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে
বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা—'

আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত নাড়লো পা নাড়লো, কোমর বাঁকালো, বুকে হাত রেখে চোখে-মুখে অত্যন্ত একটা আবিষ্ট ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলো, ইত্যাদি। গলাটা তার অত্যন্ত পাৎলা, যথাসম্ভব সরল

ও ঋজু ক'রে আনা স্বরেরও উঁচুতে উঠতে কেঁপে-কেঁপে ভেঙে যায় আর নিচুতে নামতে কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে যায়। তবু সে কলের মতো গেয়ে গেলো এবং কলের মতো নেচে গেলো, যতটুকু সে শিখেছিলো কিচ্ছু বাদ দিলে না।

শেষ হ'লে পরে সুমিতা বললে : 'বেশ!'

মেয়েটার কপাল ঘেমে উঠেছিলো, হাত দিয়ে মুছে অতি ক্ষীণস্বরে বললে : 'এখন যাই, মা?'

'আচ্ছা যাও। ওখানে গিয়ে নাচতে বললে ঢঙ কোরো না কিন্তু ব'লে দিচ্ছি।'

অপারেশনের আগে রোগীর মতো মন নিয়ে বুলু গেলো চ'লে। 'মন্দ নয় তো', বিজন ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে মন্তব্য করলে, 'মেয়েটা রীতিমতো ট্যালেণ্টেড মনে হচ্ছে।'

'মোটে গাইতে চায় না এই যা দোষ। ভালোরকম চর্চা করলে—' কী যে হ'তো সে-সম্ভাবনাটা অপ্রকাশিত রাখলো সুমিতা।

বিজন আধা চোখ বুজে যেন গানের রেশটা মনে-মনে শুনে বললে : 'চর্চা করলেই তো আর সকলের হয় না। ধরো ঐ বাবলির কথাই—মেয়ে তো কম বড়ো হ'লো না, কই, নাচ-গান তো বিশেষ—'

বিজন একটু থামতেই সুমিতা ব'লে উঠলো : 'কী হবে ও-সব দিয়ে। মেমি ইস্কুলে প'ড়ে বড়বড় ক'রে ইংরিজি বলতে পারলেই হ'লো। এ-সব ওঁদের মনেও ধরে না—সেদিন ওঁদের

বাড়িতে আজকালকার মেয়েদের এই নাচগান নিয়ে কত হাসাহাসি ইয়ার্কি শুনলে না!'

'বুঝেছি—ঐ সোমনাথ। বিদ্বান লোক কিনা—সব ব্যাপারেই ফরফরি করা চাই। সেদিন বলছিলো, এই নাচ-গান ইত্যাদির জন্য মেয়েদের আসল শিক্ষা আজকাল কিছুই হচ্ছে না। ক্যাক্ ক'রে অমনি চেপে ধরলুম, বললুম: মেয়েদের পক্ষে ওগুলোই তো আসল। তারপর কেঁচো হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো, একটি কথা বললে না। কত তো বিদ্যে শুনি, এদিকে তর্কে আমার কাছে রোজ হেরে যায়। মাষ্টারি ক'রে দিন-গুজরান করে যে,—সব বিষয়ে তার কথা বলতে আসারই বা কী দরকার! ও-সব লোককে সজুত রাখতে জানতে হয়—আমার কাছে তো বেশি ফাজলেমি করতে সাহস পায় না, মাথা নিচু ক'রেই থাকে।'

হা-হা ক'রে হেসে উঠলো বিজন ঘোষ। একটু পরে প্রাক্তন প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললে: 'মেয়েকে মেমসায়েব বানাচ্ছেন ওঁরা। আরে আমরাও তো বিলেতফেরৎ—ও-সব আদেখলেপনা আমাদের ধাতে নেই। তাও ঐ কালো মেয়ে—হুঁঃ!

একটু পরে সুমিতা বললে: 'ত্যাখো, বুলুর শিগগিরই বিয়ে দেবো—পনেরো পার হ'তে দেবো না।'

বিজন ঘোড়ার মতো শব্দ ক'রে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ভালো।'

'চারদিকে যা সব ব্যাপার দেখছি বেশি ভরসা হয় না। তার উপর তোমার মেয়ে যা রূপসী!'

'হবে না! তোমার মেয়ে তো!' স্ত্রীর দিকে একটা খোলো-খোলো ভাবালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিজন ঘোষ চোখ মিটমিট করলো।

'কে জানে হয়তো ড্রাইভারের সঙ্গেই বেরিয়ে গেলো—সব-রকমই তো হচ্ছে আজকাল। বাবাঃ—ঘরে মেয়ে থাকবার মতো জ্বালা আর কি কিছু আছে, বারোয় পড়লো কি দিবারাত্র চোখে-চোখে রাখো! বিয়ে দিয়ে আপদ চুকিয়ে দেয়াই ভালো।'

'বাস্তবিক! মেয়ে জাতটাই শয়তানের প্রতিমূর্তি', গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললে বিজন ঘোষ।

সুমিতা বললে: 'মেয়েমানুষের জন্যেই তো পৃথিবীতে যত পাপ!'

এইখানে একটু ছেদ পড়লো কথাবার্তায়। তারপর সুমিতা মাথার পিছনে দু' হাত তুলে একটা মনোহরণ ভঙ্গি ক'রে বললে: 'উঠি এবার। আবার তো যেতে হবে। সাজগোজ আছে।'

হঠাৎ বিজন বললে: 'একটা কথা বলতে তো মনেই ছিলো না। শুনেছো তোমার ভাইয়ের কাণ্ড?'

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিলো, স্বামীর দিকে আধো মুখ ফিরিয়ে বললে: 'দাদার?' কথাটার মানে এই যে এতক্ষণ তো কত কিছুই শুনলাম, এর পরেও নতুন আছে নাকি?

'প্রশান্ত আজকাল রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমি নাকি বিলেতে থাকতে একটা বিয়ে করেছিলুম!' ব'লে বিজন হা-হা ক'রে হেসে উঠলো, সে-হাসি প্রায় থামতেই চায় না।

'সত্যি নাকি ?'

'খুব কায়দা ক'রে রটাচ্ছে—ভাবখানা যেন আমার জন্তে দরদে বিগলিত।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম সত্যি বিয়ে করেছো নাকি। কী জানি বাপু, তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

এবার বিজনের অট্টহাসিটা এতই প্রচণ্ড হ'লো যে সুমিতার তখনকার মনের অবস্থাটা অন্তরকম না-হ'লে তার একটু খটকা লাগতে পারতো।

'বলা যায় না', হাসির ভস্‌ভসানি ঠেলে বিজন বললে, 'তোমার দাদা হয়তো একদিন রাস্তা থেকে একটা সাদা চামড়ার মেয়ে ধ'রে এনে সশরীরে উপস্থিত করবে।'

'তাতে ওর লাভ ?'

'আমাকে নাজেহাল করাটাই ওর লাভ। তা ছাড়া, যদি প্যাঁচ ক'ষে কিছু বখ্‌শিষ বাগাতে পারে—বুঝলে না ? ওর না-হয় ও-সব বালাই নেই, আমার তো মান-সম্মান আছে। নিজে তো বাপের ত্যজ্যপুত্র হয়েছেন, আমার যে কিছু পয়সা-কড়ি আছে সেই জ্বালাতেই ও মরলো। কী ক'রে আমার সর্বনাশ করবে এই চিন্তা।'

সুমিতা ঠাণ্ডাভাবে বললে : 'করুক্‌গে যা খুসি। যা সত্যি নয় তা রটাতে গেলে নিজেই জব্দ হবে।'

'বলো কী তুমি !' বিজন অসাধারণরকম উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। 'এ-সব লোকের মিথ্যেকে সত্য ক'রে তুলতে কতক্ষণ !

আর লোকগুলোও এমন যে কারো সম্বন্ধে কোনো কুৎসা একবার শুনলেই হ'লো—তক্ষুনি হৈ-হৈ! বরুণা সোমনাথের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে এ-কথাটা একবার ব'লেই ত্থাখো না!'

স্থমিতা বোধ হয় শেষের প্রস্তাবটাকে মনে-মনে একটু বিচার ক'রে দেখলে, তারপর বললে: 'শিগগিরই এমন দিন আসবে যখন ও-কথাটা আর বানিয়ে বলতে হবে না। চললুম স্নান করতে।'

স্থমিতা চ'লে যাওয়ার পর বিজন চুপ ক'রে ব'সে রইলো। ফলটা কী হ'লো ঠিক বোঝা গেলো না। কিন্তু ঈশ্বরের তার উপর দয়া এই যে এক বিষয়ে সে একটানা বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। একটু পরেই সে এক বিরাট হাই তুললো, উদ্‌ঘাটিত হ'লো পান-খাওয়া লাল মুখ-গহ্বরের প্রকাণ্ডতা। তারপর আরো দুটো পান মুখে পুরে উঠে চ'লে গেলো ভিতরে।

৭

মল্লিকার বাড়ি কালিঘাটে, ডিপো ছাড়িয়ে, আজকাল মনুষ্য-মক্ষিকার বসবাসের জন্য যে-সব মস্ত চাক দশ গজ পর-পরই গ'ড়ে উঠছে, তারই একটার এক ছোট গর্তে। ছোটো দু'খানা ঘর আর এক চিলতে বারান্দা নিয়ে এই দু'জন পৃথিবী-পলাতকের গৃহ-রচনা। রান্নাঘর ব'লে বাক্সর মতো একটু জায়গা আছে এক কোনে—সেটার অধিকার অনায়াসেই ছেড়েছে এরা। কলকাতায় অল্প ভাড়ার বাসিন্দেদের এ-রকম মহৎ স্বার্থত্যাগ করতে হয় প্রায়ই। ঘর দুটি শুধু পশ্চিমে খোলা; কিন্তু চিলতে বারান্দা খোলে দক্ষিণে, এবং সেটা বিশেষ একটা সৌভাগ্যই মনে করে এই নবদম্পতী। সেই বারান্দায় স্টোভে রান্না করে মল্লিকা—ভাতের মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়ানো পুঁটলি, তাতে মুগের

ডাল সেদ্ধ হয়েছে, আর আশে-পাশে দুটো-চারটে ভাইটামিনাত্মক তরকারি আধা-সেদ্ধ, মল্লিকা বুদ্ধি ক'রে সেগুলো দেরিতে ছেড়েছে। তারপর একটু মাছের ঝোল, সর্বশেষে চার-পয়সার দই। খাওয়া সেই বারান্দায় ব'সেই, খবরের কাগজ পেতে ব'সে। (কুঙ্কুমের খবরের কাগজ কেনবার অভ্যেসটাকে সাম্প্রতিক ইকনমিক্সের দোহাই দিয়ে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলো মল্লিকা—কিন্তু দৈনিক সংবাদ-সংগ্রহ ছাড়াও কাগজগুলো আরো যে কত কাজে লাগে সেটা দেখে স্বামীর সুবুদ্ধিকেই প্রশংসা করেছে।) বারান্দাতেই এদের চা-চক্র সকালে-বিকেলে, সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত এই গরমের দিনে সেখানেই কাটে। নেহাৎই যখন ঘুম পায় উঠে যায় পাশের ঘরে, সেখানে মেঝেতে পরিপাটি বিছানা মল্লিকা পেতে রেখেছে অনেক আগেই। তোষকের উপর একটি চিকণ পাটি আর গোটা চারেক বালিশ—তাদের বর্তমান সম্পত্তির মধ্যে এই পাটিখানাই তাদের সব চেয়ে আদরের—বোধ হয় আর্থিক হিসেবেও সব চেয়ে মূল্যবান। তার পাশের ঘরটা—সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সেটা প্রথম—সেটা রয়েছে কোনো আকস্মিক অতিথির অভ্যর্থনায় প্রস্তুত। বেতের একটি টেবিল আর ঠিক দু'খানা চেয়ার কুঙ্কুম কিনেছিলো তার ক্ষীণ মূলধন থেকে। ঐ ঘরেরই দেয়াল ঘেঁষে তাদের বাক্স-তোরঙ্গর জায়গা হয়েছে—তিনটাই সব সুদ্ধ—পুরোনো রঙ-চটা শয্যাবরণে ঢাকা। শোবার ঘরের দেয়ালে পাঁচসিকে দামের গোল আয়না—তারই নিচে ছোট্ট তেপায়া

বাঁশের গোল টেবিলে (এটা মল্লিকা কিনেছিলো অনেক দর-দস্তুর ক'রে বারো আনা দিয়ে) কুঙ্কুমের ক্ষুর ইত্যাদি আর মল্লিকার চুলের কাঁটা ফিতে। তা ছাড়া যে পাউডরের কৌটোটি আছে সেটা নামে মল্লিকার হ'লেও কুঙ্কুমের মুখমণ্ডলও কখনো-কখনো তাতে শুভ্র ও সুরভি হয়। আয়নার পাশেই ব্র্যাকেটে শোভা পাচ্ছে উভয়ের স্বল্প গাত্রবাস। শোবার ঘরের তিনটে দরজা, একটা বারান্দার দিকে, আর একটা গেছে বাইরের ঘরে, আর তৃতীয়টা স্নানের ঘরের প্রবেশ দ্বার, সে-ঘর এতই ক্ষুদ্র যে প্রায় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। তবু সেখানেও আছে যুগল-জীবনের চিহ্ন দু' রঙের দুটো টুথব্রাশ, দু' রঙের পাড়-তোলা দু'খানা তোয়ালে। তা ছাড়া আছে একখানা গা ধোবার সাবান, আর একখণ্ড কাপড় কাচবার—গেঞ্জি রুমাল ব্লাউজ তাতেই কাচে মল্লিকা—আর আছে এক কোনে ঝাঁটা আর ফিনাইলের ক্যানেস্তারা—জমাদারের কাজটা গৃহস্বামীই চালিয়ে দেন। ছাত্রাবস্থায় বই রাখবার জন্যে গোটা কয়েক বেতের শেল্‌ফ্‌ কুঙ্কুমের প্রাইভেট প্রপার্টির মধ্যে ছিলো : তারই একটা এখন চালান হয়েছে বাথরুমে। আর-একটা আছে শোবার ঘরে গুটিকয়েক ইংরিজি বাঙলা কবিতার বই সগর্বে বহন ক'রে, এবং তৃতীয়টি মহার্ঘ দক্ষিণ-খোলা বারান্দার খানিকটা জায়গা জুড়েছে, সেখানে তাদের ভাঁড়ার।

এ থেকে বোঝা যাবে যে আর যা-ই হোক্‌ আসবাব-বাহুল্যে পীড়িত নয় এরা। রান্না-খাওয়ার সরঞ্জামের মধ্যে ছোটো একটি

এলুমিনিয়মের প্যান, ছোটো একটি কড়াই, জলের কুঁজো, গোটা কয়েক কাচের গেলাস আর চীনেমাটির থালা আর চায়ের বাসন। গুঁড়ো মশলা কিনে আনে, চায়ের সঙ্গে চলে বিলিতি টিনের দুধ; আর পান খাওয়াটা এরা বিলাসিতার মধ্যেই রেখেছে, কখনো-কখনো আসে নিচের দোকান থেকে মিঠে পানের খিলি। চাকর নেই, চাকরের দরকারও নেই। কুঙ্কুম বাজার থেকে মাছ-তরকারি নিয়ে আসে খবরের কাগজে জড়িয়ে (কাগজ কেনবার আরো একটা সার্থকতা), মল্লিকা ছুরি দিয়ে সেগুলো কাটা-ছোলা করে, খাবার পরে দু'খানা বাসন ধুয়ে আনে স্নানের ঘর থেকে। (উভয় কাজেই কুঙ্কুম সাহায্য করতে ব্যগ্র, মল্লিকা তাকে আমলই দেয় না। চায়ের বাসন নিয়ে একটা অশোভন কাড়াকাড়ি দু'জনের মধ্যে প্রায়ই হয়, এবং সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে কুঙ্কুম লুকিয়ে সেগুলো ধুয়ে রেখেছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়।) মনে-মনে দু'জনেই এরা ভেবে দেখেছে যে তাদের যে শুধু চাকর রাখবার দরকার নেই তা নয়, চাকর না-রাখবার দরকার আছে। অতটুকু বাড়ির মধ্যে আস্ত আর-একটা মানুষের দিনরাত উঁকিঝুঁকি ঘুরঘুর সহ্য হ'তো না কিছুতেই। একসঙ্গে থাকবার জন্যেই তো বিয়ে করা, আর বিয়ের পরেই সেই যুগল-জীবন যদি অতৃতীয় হয় তার মতো সুখ কিছু নেই। চাকরটাকেও মনে হয় মূর্তিমান উৎপাত। পরিজনের বিরাগভাজন হ'য়ে তারা পেয়েছে অবারিত অপরিমিত স্বাধীনতা—সেটা নির্লজ্জ, সেটা নির্লজ্জ হওয়াই দরকার

পরিক্রমা

বাড়িভাড়া তিরিশ টাকা। কারেণ্ট সুদ্ধ। এর চেয়ে সস্তায় কলকাতায় মানুষের বাসগৃহ পাওয়া যায় না, মাইক্রোবের কারখানা পাওয়া যায়। তিন মাসের অভিজ্ঞতায় জেনেছে মাসে আশি টাকা হ'লে তাদের বেশ কুলিয়ে যায়—বাস্‌ভাড়া আর দু' একটা সিনেমা নিয়েও। আশি টাকা এমন বেশি কিছু নয়। কিন্তু কুঙ্কুমের রোজগার গড়পড়তা ষাট টাকার বেশি হয় না। রোজগারের উপায় সে বাৎলেছে বেনামিতে গোয়েন্দা-নভেল লেখা: এক পাব্লিশর জুটিয়েছে, সে বই-পেছু পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেয়। তার শেল্‌ফের অক্সফোর্ড-মার্কা সাড়ে-তিন শিলিং-এর ইংরেজ কবিরা সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন পশ্চাদ্বর্তী দু'পেনি ছ'পেনিওয়ালা বিচিত্র থ্রিলর গ্রন্থ—ও-সব পড়তে হবে ভাবতে সত্যি গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু ও-সমস্তই পড়তে হয় কুঙ্কুমকে, তারপর টিটাগড়ের রাইটিং প্যাড আর তার ছাত্রজীবনের ফাউণ্টেন পেন নিয়ে ব'সে যায় ভাষান্তর-কার্যে। ভাষান্তর না-ব'লে জন্মান্তর বললেই ভালো হয়। বাঙালি মেয়ে লিলি যখন রিভলবর বুকে লুকিয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষালের সঙ্গে মাতাল হবার ভাণে ঢলাঢলি করতে-করতে একটা খুব দরকারি দলিল নিয়ে পালিয়ে যায়—সে-ছবিটা মনে-মনে কল্পনা ক'রে কুঙ্কুম যে-রকম রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে সে-রকম তার কোনো পাঠকই হবে না এটা নিশ্চিত। তার উপর কাটাছেঁড়া করতে-করতে এমন হয় যে আগাগোড়া কোনো সঙ্গতিই

হয়তো থাকে না। তাতে স্থবিধে দুটো: বই ছোটো হয়, আর যদি বা কখনো কপিরাইটের কথা ওঠে (সে-আশঙ্কা নেই বললেই চলে) তাহ'লে সে-গল্প ব'লে চেনা যাবে না। স্থখের কথা যে প্রকাশক ঠিক এইরকমই চান। আরো বেশি স্থখের কথা এই যে ছ'পেনির থ্রিলর-গল্পকে 'নষ্ট' করার কোনো কথাই উঠতে পারে না; গল্পগুলোই এমন যে তারা ভালো-মন্দর বাইরে। কাজটা করতে তার মনের যন্ত্রণা হয়, কিন্তু বিবেক পীড়িত হয় না। ওমর খৈয়ম কি কালিদাসকে সচিত্র 'অনুবাদে'র ফাঁসিকাঠে চড়াবার চাইতে অর্থোপার্জনের এটা অনেক সৎ পন্থা এ-সান্ত্বনা আছে তার মনে।

এ-পর্যন্ত কুঙ্কুম তিনখানা বই বেচেছে। তা ছাড়া কাগজ-ওয়ালাদের থেকে কখনো-কখনো পুষ্পবৃষ্টি হয়। সে লেখক নয়, পুরোদস্তুর ভাড়াটে হ্যাক্ হবে এমন জোরও তার নেই। তবে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ছেলে পড়ানোর চাইতে এটাই ভালো মনে করেছিলো। উঁচুদরের টিউশনিও সব প্রোফেসরদের একচেটে, সেখানে নাক ঢোকানো অসম্ভব। এ-রকম ক'রে চিরকাল চলবে তা অবিশ্যি ভাবা যায় না, চিরকালের কথা ভাবেই না সে; আপাতত চললেই হ'লো। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করুক, টানাটানি হয়, বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ে, বাজারের পয়সা থাকে না। এদিকে প্রকাশক ব'লে দিয়েছেন আপাতত তার বইয়ের আর দরকার নেই।

মনে-মনে আশা আছে সামনের জুলাই মাসে কোনো কলেজে

একটা মাষ্টারি হয়তো জুটবে তার। পাশ-করনে-ওয়ালা সে ভালোই ছিলো। পয়লা-মার্কা এম্-এ ডিগ্রি আছে। অতদূর পড়তে পেরেছিলো জলপানির জোরেই। বাপ যখন মারা যান সে বালক। পিতার মৃত্যু, এমনিতে দেখতে গেলে, মোটেও শোকাবহ নয়। পুরোনো কাল নতুন দিনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু অবস্থাবিশেষ সেটা মর্মান্তিক হ'তে পারে। শোকের কারণ তখনই ঘটে, যখন পিতা কিছুই রেখে যান না। বিশেষ পুত্রও যদি তখন উপার্জনহীন হয় তাহ'লে তো সর্বনাশ। কুঙ্কুমের বাপ কিছুই রেখে যাননি। তার অন্যান্য আত্মীয়ের দিকটাও মোটে জোরালো নয়। এক কাকা ছিলেন বহুদূর দেশে স্টেশনমাষ্টার, নিজের অগুনতি পুত্রকন্যা নিয়ে মগ্নপ্রায়। মামা আছেন দু' একজন—তাঁরা অকপটেই গরিব। সুতরাং বিধবা মা রইলেন দেশে, আর কলকাতায় হস্টেলবাসী হ'য়ে এক পরীক্ষার স্কলারশিপের ইষ্টিমে পরবর্তী পরীক্ষা পার হ'তে লাগলো কুঙ্কুম। এম্-এ পাশ করতে-করতে মা-ও গেলেন মারা। জীবনে কোনো বন্ধন কোনো আকর্ষণ কোনো দায়িত্বই তার রইলো না। নিঃসঙ্গতা পূর্ণ হ'লো তার। ভালোই হ'লো। সাংসারিক জীবনের উপর লোভ থাকবার কোনো কারণ ঘটেনি তার, ভাগ্য সেটা থেকে তাকে রেহাই দিলে ভেবে সে খুসিই হ'লো। সকলেরই জীবন একভাবে কাটবে তার তো মানে নেই। যেটা তার মনে হ'তো সাংসারিকতার অবরুদ্ধ অন্ধকার, অতি ক্ষুদ্র মন নিয়ে অতি কষ্টে জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে খাওয়া-পরা বাড়ি-ঘর

ছেলেপুলের সঙ্কীর্ণ চক্রপথে ঘুরে-ঘুরে মরা—সেটা হয়তো তার জীবনে কখনোই ঘটবে না। কোনো কলেজে ঢুকতে যদি পারে, যথাসাধ্য অল্প ব্যয় ক'রে যথাসম্ভব জমাবে, তারপর একদিন বেরিয়ে পড়বে যতদূরের রাস্তা তার সঙ্গতিতে কুলোয়। ইয়োরোপ তার মনকে তত বেশি টানে না—ইয়োরোপ আজকাল আমাদের ঘরের বড়ো কাছাকাছি এসে পড়েছে। সে যাবে দক্ষিণ আমেরিকায়, যাবে জাভা বালি সুমাত্রা হ'য়ে প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জে, যাবে সেই সব দেশে যেখানে কোনো প্রাচীন সভ্যতা ইয়োরোপের (কি আমেরিকার) আক্রমণে কাবু হ'য়ে-হ'য়েও এখনো টিঁকে আছে—যদি কখনো তার যথেষ্ট টাকা হয়।

তার মনের অবস্থা যখন এইরকম আর আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় তখন দুপুরবেলায় আর কোনো কাজ খুঁজে না-পেয়ে সে ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়তো নানা দূর ও দুর্গম দেশের পর্যটনের বৃত্তান্ত। মল্লিকার সঙ্গে প্রথম দেখা সেখানে। মল্লিকা এসেছিলো আর দুটি মেয়েকে নিয়ে ইকনমিক্সের কী একটা দুরূহ বইয়ের সন্ধানে। তার জন্যে ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরিতে আসা অবিশ্যি অর্থহীন সৌখিনতা—কিন্তু এমনি অর্থহীনতা দিয়েই ভাগ্যের অনেক ষড়যন্ত্রের সুরু। যেখানে কুঙ্কুম ব'সে ছিলো মাথা নিচু ক'রে, তারই একটু দূরে বসলো তিনজন মোটা-মোটা বই নিয়ে, কিন্তু পড়াশুনোর চাইতে ফিসফিসে চাপা গলায় গল্পই

হচ্ছিলো বেশি। চারদিকে অনেকের চোখই উঠছিলো, কুঙ্কুমের চোখও একবার উঠেই নেমে গেলো। ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে সে চেনে। তার সঙ্গে বি-এ পড়েছে, ইকনমিক্সে এম্-এ পাশ করেছে তার বছরেই। কুঙ্কুম ভয়ে-ভয়েই চোখ নামিয়ে নিলে পাছে চোখোচোখি হয় এবং লীলা ইচ্ছা ক'রে না-চেনে। মহিলারা এবং অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকরা অনেক সময় এ-রকম করেন এ-অভিজ্ঞতা তার আছে। বিশেষভাবেই সে ডুবলো দক্ষিণ আমেরিকার ইতিবৃত্তে। কিন্তু বইটা বিশেষ ভালো মনে হচ্ছিলো না; সেটা নিয়ে উঠে গেলো অন্য-কিছুর আশায়। ঝুঁকে প'ড়ে ক্যাটালগ দেখছে এমন সময় টের পেলো পিছনে সেই মেয়েরা দাঁড়িয়ে। তাকাতে হ'লো, এবং তাকাতেই লীলার সঙ্গে চোখোচোখি।

লীলা বললে: 'আপনি এখানে!'

'আমিও সেই প্রশ্ন করতে পারি।'

'আমি এসেছিলাম এদের নিয়ে—আমার বন্ধু, আপাতত ছাত্র। এরা বি-এ দেবেন সামনের বার। মীরা গুপ্ত, মল্লিকা সিংহ। ইনি কুঙ্কুম মিত্র, এবার ইংরিজিতে ফর্স্ট হয়েছেন।'

নমস্কার ও প্রতিনমস্কার হ'লো।

সেই মুহূর্তেই কি কুঙ্কুম মল্লিকার মধ্যে বিশেষ-কিছু দেখেছিলো, তিনজনের মধ্যে শুধু তাকেই দেখেছিলো কি? কে জানে। কিন্তু সেখান থেকেই সুরু।

লীলা বললে 'আপনার জ্ঞানের পিপাসা এখনো মেটেনি দেখছি।'

'সময় কাটাচ্ছি', লজ্জিতভাবে বললে কুঙ্কুম।

'রোজই আসেন নাকি ?'

'রোজই প্রায়।'

আর কিছু আলাপ করবার নেই, সুতরাং লীলা বললে : 'আচ্ছা। এঁদের জন্যে একটা নোট নিয়ে গেলুম।' বই ফিরিয়ে দিয়ে তিনজন গেলো চ'লে।

বাইরে এসে মীরা গুপ্ত বললে : 'ছেলেটি দেখতে বেশ তো।' আর মল্লিকা তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো, 'বাঃ, কী যে ফাজলেমি করিস্।'

পরের দিন মল্লিকার মনে হ'লো যে লীলা-দির নোট যথেষ্ট হয়নি, মূল বইটা ভালো ক'রে দেখা দরকার। সে-বইটা তাদের কলেজের লাইব্রেরিতে আছে কিনা জানে না ; পাছে পাওয়া যায় সে-ভয়ে খোঁজও করলো না। গেলো ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরিতে। বই নিয়ে ব'সে দেখলো, ঠিক কালকের জায়গায় কুঙ্কুম ব'সে। কিন্তু কুঙ্কুম তাকে ছাখেনি, কখনো দেখবে এমন মনে হ'লো না। পড়তে চেষ্টা করলো, কিছুই ঢুকলো না মাথায়। অত্যন্ত রাগ হ'লো নিজের উপর, ইচ্ছে করলো বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।

কিন্তু হঠাৎ কুঙ্কুমের চোখ পড়লো। লাল হ'য়ে উঠে চোখ নামিয়ে নিলে। কথা বলবে কি বলবে না এই ভাবতেই দশ

মিনিট গেলো। তারপর আবার চোখ তুলতেই দেখলো মল্লিকা তারই দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চমকে উঠলো মল্লিকা, কী করবে ভেবে না পেয়ে বই হাতে ক'রে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে কুঙ্কুমও এলো বেরিয়ে। কাছে গিয়ে বললে: 'আপনার পাঠে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি ভাবতে লজ্জিত হচ্ছি। আপনিই তো কাল মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে এসেছিলেন?'

'এসেছিলাম।'

'আসল কথা এই যে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম না।'

'কেন, চিনতে পারবো না কেন?'

'চিনতে পারবেন কিনা মানে চিনবেন কিনা!'

'ও।' মল্লিকা মৃদু হাসলো।

'সেইজন্যেই, দেখুন, আমিও চেষ্টা করেছিলুম আপনাকে না-চিনতে', ব'লে কুঙ্কুমও হাসলো। 'আপনার বুঝি পড়া হ'য়ে গেলো। আচ্ছা—'

কুঙ্কুম যাচ্ছিলো ফিরে, মল্লিকা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো: 'ওঃ, আমার পড়াশুনো কিছু নয়। বইয়ের পাতা ওল্টানো।' সত্য কথাই বললে।

'পরীক্ষার জন্যে কতটুকুই বা পড়তে হয়, তার জন্যে এতদূর দৌড়—'

মল্লিকা ব'লে উঠলো: 'সত্যি! কাল লীলা-দি নিয়ে এলেন ধ'রে। উনি যে অনেক পড়েছেন সেটা দেখানোই বোধ হয়

উদ্দেশ্য। ক্ষমা করবেন—আপনার কাছে তাঁর সম্বন্ধে এটা বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে।' মল্লিকা লাল হ'য়ে উঠলো।

কুঙ্কুম সহজভাবে হেসে বললে: 'তাতে কী হয়েছে! পরস্পরের সম্বন্ধে আড়ালে আমরা ও-রকম ব'লেই থাকি। আপনি কাল আবার আসবেন নাকি?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে মল্লিকা বললে: 'ইকনমিক্স শাস্ত্রটা আপনার আয়ত্তের মধ্যে কেমন?'

কুঙ্কুম মাথা নেড়ে বললে: 'বর্ণপরিচয়ও হয়নি।'

'আপনি ভাগ্যবান। আধুনিকতার মারপ্যাঁচে প'ড়ে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে ছিলুম, এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। ভেবেছিলুম আপনার কাছ থেকে যদি কিছু পথনির্দেশ পাওয়া যায়।' শেষের কথাটা সেই মুহূর্তে উদ্ভাবন ক'রে বললে, সে-রকম কিছুই সে ভাবেনি।

কুঙ্কুম ভদ্রভাবে বললে: 'সেটা আমারই সৌভাগ্য হ'তো।—কিন্তু আপনাকে আটকে রাখছি না তো?'

'আমার তো কোনো কাজকর্ম নেই, আপনারই পড়াশুনোর ক্ষতি করলাম।'

'পড়াশুনো করাটা, অনেকের মতে, নিষ্কর্মা হবারই একটা ভদ্র নাম। আমার পক্ষে আপাতত সম্পূর্ণই তা-ই।'

মল্লিকা হঠাৎ বললে: 'আপনার কথা আগে শুনেছি। কখনো দেখা হবে আশা করিনি।'

'আপনার কথা কখনো শুনিনি ব'লেই আপনার সঙ্গে দেখা

হওয়াটা আমার পক্ষে এত বড়ো আশ্চর্য ঘটনা।' কথাটা ব'লেই কুস্কুম গম্ভীর হ'য়ে গেলো। এ-ধরণের কথা কখনো বলা উচিত নয়। মনের মধ্যে তো কত কথাই ওঠে—কত বাজে, কত আজগুবি হাস্যকর, কত ক্ষণিক-রঙিন কথা—কখনো কি সে-সব মুখে আনতে আছে!

মল্লিকাও যেন হঠাৎ চকিত হ'য়ে বললে: 'এবারে আমি যাই।'

কুস্কুম এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো, তারপর:

'চলুন আপনাকে ট্র্যাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।'

'যাবেন?' মুহূর্তে একটা আভা ঝিলকিয়ে উঠলো মল্লিকার মুখে। 'চলুন।'

দুঃখের বিষয়, ট্র্যাম বেশি দূরে নয়। ঐটুকু সময়ের মধ্যে যা কথা হ'লো, তা এই।

'আপনি কোথায় থাকেন?' কুস্কুম জিজ্ঞেস করলে।

'কলেজের হস্টেলে। আপনি?'

'এতকাল ঐ হস্টেল নামক বাসগৃহেই কেটেছে।'

'এখন?'

'এখন আছি মির্জাপুরে একটা মেস্-এ।'

'ও।'

একটু চুপচাপ।

'কাল আপনি আসবেন?' কুস্কুম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে।

'না।' বলেই মল্লিকা ভাবলে, কেন 'না' বললাম।

'আসবেন না!' কথাটা প্রশ্ন নয়, দাবি নয়, মনে-মনে শান্ত ভাবে মেনে নেয়া যেন। 'আসতে পারি হয়-তো', কুণ্ঠিতস্বরে মল্লিকা বললে।

কিন্তু তার উত্তরে কুঙ্কুম শুধু বললে: 'ঐ আপনার ট্র্যাম এলো।'

মল্লিকাকে নিয়ে ট্র্যাম গেলো চ'লে। ফেরবার আগে কুঙ্কুম একটু দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তায়। তখন শীতকাল। আকাশে অঢেল আলো। কলকাতার হৃৎপিণ্ডে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ চারদিকের জনস্রোত যানস্রোত কেমন অদ্ভুত লাগলো তার চোখে, যেন এই প্রথম দেখছে। ঐ তো লেডলর বাড়ি, ভিক্টরিয়া হাউস, টাওয়ার হাউস, আমেরিকান এক্সপ্রেস আর গবর্মেণ্ট হাউসের মুখোমুখি নিশেন, ময়দান মনুমেণ্ট চৌরঙ্গি—আর জীবনের কত লক্ষ ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত ওঠা-পড়া। কী সুন্দর এই কলকাতা, মনে-মনে সে বললে।

এর পর রোজই তাদের দেখা হ'তে লাগলো। কুঙ্কুম কিছু ভাবলে না, নিজেকে কিছু ভাবতে দিলে না। উন্মীলিয়মান জীবন তীব্র ব্যথার মতো। সে-অনুভূতি এমন নির্মম যে আর-কিছুরই জায়গা রাখে না। ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরিতে গিয়ে সে যথারীতি বই খুলে বসে, এক লাইনও পড়ে না। একটু পরে মল্লিকাও এসে বসে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা বই নিয়ে। তারপর খানিকটা ভদ্ররকম সময় বাদ দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে উঠে যায়।

এই সময়ে কুঙ্কুম পয়সা না-থাকবার অসুবিধে অতি নগ্নভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো। হাতে তার কোনোকালেই পয়সা থাকে না—সেটা এতদিনে তার এত বেশি স'য়ে গেছে যে কিছু আর মনে হয় না। তিরিশটাকার একটা টিউশনি ছিলো সেই সময়ে তার সম্বল। তার পক্ষে যথেষ্টই মনে করতো। চেষ্টা করলে আরো পেতো, চেষ্টা করাটাই দরকার মনে করেনি। বরং ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরিতে ব'সে বই পড়া ভালো। কিন্তু সেই লাইব্রেরি থেকে যখনই রাস্তায় বেরুলো মল্লিকার সঙ্গে, তার শূন্য পকেট সমস্ত অন্তরাত্মায় হায়-হায় ক'রে উঠলো। এখন তারা কী করবে, এখন তারা কোথায় যাবে? রেস্তোরঁা আছে, সিনেমা আছে, কিন্তু ঠিক একটি আনির জোরে তার কোনোটাতেই প্রবেশ করা যায় না।

ছাত্রের বাপকে ব'লে কুঙ্কুম দশ টাকা অগ্রিম জোগাড় ক'রে ফেললো। আস্ত একটা দশ টাকার নোটের বাজে খরচ জীবনে সে কখনো করেনি। মনে-মনে রাজার মতো লাগলো নিজেকে। একদিন মল্লিকাকে বললে: 'চলুন আজ একটু চা খাই। ঐ কোনের ছোট্ট দোকানটা বেশ।'

মল্লিকা বললে: 'থাক্। চলুন চৌরঙ্গি দিয়ে একটু হাঁটি। তারপর ট্রামে উঠবো।' এর আগে পর্যন্ত এই তাদের রীতি ছিলো।

পকেটে কলাগাছ-মার্কা নোটের উষ্ণতা অনুভব করতে-করতে কুঙ্কুম বললে: 'আজ একটু বসতে ইচ্ছে করছে, চলুন।'

চা খেতে-খেতে মল্লিকা বললে : 'আসতে-আসতে রোজই মনে হয়, আপনি হয়তো ঐ ট্র্যামটাতেই উঠবেন।'

কুঙ্কুম চায়ে চুমুক দিতে মাথা নিচু করলো।—'আমি—আমি হেঁটেই আসি।'

'হেঁটে আসেন!'

এবার কুঙ্কুম সোজা মল্লিকার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে : 'দূর তো বেশি নয়—সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে বারো মিনিটে চ'লে আসি। শীতকালে কিছু মনেই হয় না।—আসল কথা', কুঙ্কুম কাঁপা গলায় অল্প হেসে উঠলো, 'ট্র্যামের মাশুল প্রায়ই থাকে না আমার পকেটে।'

এ-কথার উপরে কী বলবে মল্লিকা ভেবেই পেলো না। সে একটু লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর কুঙ্কুমের মতো ক'রেই একটু হেসে উঠলো, তারপর চুপ ক'রে রইলো ওমলেটের থালার দিকে তাকিয়ে।

কথাটা একটা ঝোঁকে ব'লে ফেলে অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছিলো কুঙ্কুম। এটা বলবার কোনোই দরকার ছিলো না—বিশেষ এই চা খেতে এসে! এমন কথা নয় যা শুনে অতিথি ভালো ক'রে খেতে উৎসাহিত হ'তে পারে। কথাটা নিতান্ত নির্বোধ ও রুচিহীন। কিন্তু এর উপর গাম্ভীর্যের শীল-মোহর আঁটালে আরো অসহ্য হবে মনে ক'রে সে হাসতে-হাসতে বললে : 'বাঃ, চুপ ক'রে রইলেন কেন, এতে কিছু নেই। ওমলেটটা খান।'

মল্লিকা ক্ষীণগলায় বললে : 'খাচ্ছি।'

কুঙ্কুম সোৎসাহে বলতে লাগলো : 'দেখুন, আপনি ইকনমিক্স পড়েন, আপনি এ-সব ব্যাপার বুঝবেন। আজকালকার পৃথিবীর একটা খুব শক্ত ব্যামো হয়েছে, তার নাম হচ্ছে ম্যালডিস্‌ট্রিবিউশন অব ওয়েল্‌থ্‌। আমি তারই একটা উদাহরণ। আমার মতো পৃথিবীতে এমনি লক্ষ-লক্ষ আছে। এ নিয়ে বলবার কিছু নেই। ওমলেটটা খান।'

মল্লিকা ছুরি দিয়ে একটু ওমলেট কেটে মুখে দিলে, কিন্তু কিছু বললে না।

বেপরোয়া একটা ফুর্তির ভাবে বললে কুঙ্কুম : 'দেখুন, এ-ক'দিনের পরিচয়ে আমরা নানা বিষয়ে নানা কথাই বলেছি, কিন্তু পরস্পারের সম্বন্ধে আমরা কিছুই প্রায় জানিনে এটা আশ্চর্য নয় কি?'

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে মল্লিকা থামলো। তাকালো চোখ তুলে।

'যদি অনুমতি করেন নিজের কথা কিছু বলি। সংক্ষেপেই বলবো। আমার বাপ নেই। মা নেই। ভাই-বোন নেই। বিধাতা স্বয়ং আমার অটোনমি ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন—সম্পূর্ণ ও স্বর্তহীন স্বাধীনতা বললেও ভুল হয় না। কারুর তোয়াক্কা রাখিনে। পরীক্ষার লগি ঠেলে-ঠেলে জীবনের মোহানায় এসে পৌঁচেছি, কিন্তু জীবন-জলধি পার হ'তে পারবো এমন ভরসা বড়ো দেখিনে।—এইবার আপনার সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি।'

কোথা থেকে এক হাওয়া এসে মল্লিকার মনের মেঘ যেন নিয়ে গেলো উড়িয়ে। মুচকি হেসে বললে: 'আমার বাপ আছেন, মা আছেন, ভাই-বোন আছে—অনেকগুলি। চারদিকে মাসিপিসি ইত্যাদির সংখ্যাও অল্প নয়। বাপ থাকেন ঢাকায়। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত সেখানেই পড়েছি। তারপর কলকাতায়। পড়াশুনোতে বেশি মন নেই, সামান্য বুদ্ধিশুদ্ধি হয়তো আছে। অন্তত এটা বোঝবার মতো বুদ্ধি আছে যে পাশের ভেলায় চ'ড়ে জীবনের মোহানা পর্যন্তও পৌঁছনো যাবে না।'

তারপর সেদিন তাদের আরো অনেক কথা হ'লো। কুঙ্কুম আরো দু'পেয়ালা চা নিলে, অমিতব্যয়িতার উন্মত্ততায় এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললো। দোকান থেকে যখন বেরুলো, শীতের ছোটো বেলা সন্ধ্যার সীমান্তে এসে ঠেকেছে।

ঘন-ঘন ঘটতে লাগলো দ্বৈত চা পান। তলায় এসে ঠেকলো কুঙ্কুমের কলাগাছ মার্কা নোট। এর পর কোত্থেকে টাকা জোগাড় হবে সে জানে না। আর একটা টিউশনির চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ভাগ্য এক অপ্রত্যাশিতভাবে তার সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে।

একদিন মল্লিকা বললে: 'কাল আমি চ'লে যাচ্ছি।'

চ'লে যাচ্ছি! কুঙ্কুম অনেকক্ষণ মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, চুপ ক'রে। কথাটা যেন একটা বিষাক্ত তীরের মতো

কতদূর থেকে কতদিন ধ'রে উড়ে আসছিলো, এইমাত্র তার বুক চিরে বেরিয়ে গেলো। যন্ত্রণায় বোবা হ'য়ে গেলো সে। এতদিন সে চলেছিলো যৌবনের ভরা জোয়ারে ভেসে, কিছু ভাবেনি, কোনোদিকে তাকায়নি, মনে হয়েছিলো এমনি বুঝি চলবে চিরকাল। আজ হঠাৎ শুনলো মল্লিকা চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু যাবেই বা না কেন, একদিন তো যাবেই। অতি স্বাভাবিক অনিবার্য ঘটনা, এটা তার আগে থেকেই ভেবে রাখা উচিত ছিলো। সে বুঝি ভেবেছিলো যে চিরকাল এমনি তাদের দেখা হবে পথে-ঘাটে লেডলর মোড়ে, রেড রোডের কোনের বেঞ্চিতে, আরো এগিয়ে গিয়ে উটরামের মূর্তির তলায়, আর এমনি তারা চা খাবে আর গল্প করবে যতক্ষণ সন্ধে না হয়!

অনেকক্ষণ পর কুঙ্কুম জিজ্ঞেস করলে, অতি ক্ষীণস্বরে: 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ঢাকায়।' মল্লিকার স্বরও বিশেষ সজীব শোনালো না।

তা-ও তো বটে। ঢাকাতে তো যেতেই হবে। বাবা আছেন, মা আছেন, আছে ভাই-বোন—অনেকগুলি।

'টেস্ট হ'য়ে গেলো কিনা, এখন আর না-গিয়ে করি কী।'

'ও, তাহ'লে তো পরীক্ষার সময় আবার আসবেন।' মুহূর্তের জন্যে জ'লে উঠলো কুঙ্কুমের মন।

'ক'দিনের জন্যই বা।'

গভীর কুয়োতে ঢিল ছুঁড়লে অনেকক্ষণ পর যে-শব্দটা ফিরে আসে, মল্লিকার কণ্ঠস্বর যেন সেইরকম। সঙ্গে-সঙ্গে কুঙ্কুমও নিবে

গেলো। কিন্তু এ কী অদ্ভুত, এ কী আশ্চর্য। আলাপ তাদের কুড়িদিনের মাত্র। কোনোদিন কিছু ছিলো না, বেশ ছিলো যে যার মনে, হঠাৎ কেমন ক'রে দেখা হ'লো—তারপর এই কয়েকদিনেই কোথায় চ'লে এসেছে তারা, কোন্ সর্বনাশের প্রান্তে। কুঙ্কুম চেষ্টা করলো মনটাকে খুব শক্ত ক'রে ফেলতে: এ কিছু নয়, কিছু নয়, দু'দিনেই কেটে যাবে।

'কালই যাচ্ছেন?' দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর কুঙ্কুম জিজ্ঞেস করলে।

'কালই।'

তারা হাঁটছিলো চৌরঙ্গি ধ'রে দক্ষিণ দিকে, হঠাৎ কুঙ্কুম থামলো।

'আমাদের সেই ছোট্ট রেস্তোরাঁটাকে অনেকদূর ফেলে এসেছি।'

'আজ আর যাবো না। চিঠি লিখবেন?' শেষের কথাটা বলবার জন্য মল্লিকা যেন নিজেকে অনেকক্ষণ ধ'রে প্রস্তুত করছিলো, হঠাৎ ব'লে ফেললো এক নিঃশ্বাসে।

'চিঠি?'

'চিঠি লিখবেন না?'

'আপনাকে?'

'যদি ইচ্ছে না করে বা দরকার মনে না করেন তা'হ'লে থাক্।'

'আমি তো ভেবেছিলাম এখানেই শেষ হ'লো', হঠাৎ কুঙ্কুম ব'লে ফেললো।

মল্লিকার তীব্র দ্রুত দৃষ্টি আগুনের ঝলকের মতো কুঙ্কুমের মুখের উপর পড়লো। 'ও! বেশ, তা-ই হবে', ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কুঙ্কুম তার মনকে যেটুকু শাসনের মধ্যে এনেছিলো, মল্লিকার এই অভিমানের প্রকাশে তা ভেঙে গেলো চুরমার হ'য়ে। অস্পষ্টস্বরে বললে, 'তা ছাড়া আমাদের উপায় কী?'

হাঁটতে-হাঁটতে মল্লিকার হাত হঠাৎ কুঙ্কুমের হাতে এসে লাগলো।

'শেষ যেখানেই হোক্, তোমাকে কোনোদিন ভুলবো না', বললে কুঙ্কুম।

ঢাকায় চ'লে গেলো মল্লিকা। তার বাপ মন্মথ সিংহ সেখানকার নাম-করা ডাক্তার। পয়সা পান ঢের, খরচও অল্প নয়। অনেক ছেলেমেয়ে, তার উপর আত্মীয় আশ্রিত ইত্যাদি লেগেই আছে। বড়ো ছেলে ডিপ্‌টি হয়েছে; বড়ো দুটি মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে, তাদের স্বামীরাও নগণ্য নয়। মোটের উপর বেশ ভরপুর, ঝমঝমে ব্যাপার, এবং ঝমঝমানির প্রতিধ্বনি বাইরে অনেকদূর পৌঁছয়। সেটা বোঝা যাবে এই বললেই যে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের মধ্যে মল্লিকার শ্রেষ্ঠতা আশে-পাশের অনেকেই একবাক্যে স্বীকার ক'রে থাকেন।

প্রতি মেয়ের বিয়েতে মন্মথ ডাক্তার হাজার পনেরো টাকা খরচ করেছেন এমন একটা জনরব আছে। মল্লিকার ভাগে তার কিছু বেশিই হবে, কেননা সিংহ-কন্যাদের মধ্যে তার

অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠতা। ঐ টাকার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশই 'ইতরজনের' মিষ্টান্নভোজে ব্যয়িত হয়েছে, বেশির ভাগই গেছে কোনো-না-কোনোরূপে স্বয়ং পাণিগ্রহীতার করকমলে। মন্মথ সিংহ মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছেন—নেহাৎই হাল-ফ্যাশানের হ'তে হবে ব'লে। এটা বিবাহের একটা পথ-প্রস্তুতি মাত্র। বড়ো বয়েসের পাশ-করা মেয়েরই জোর চাহিদা আজকাল, এবং মেয়েদের ভালো বিয়ে তো দিতেই হবে। মল্লিকা বি-এ দেবে এবারে; রোগী দেখার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি দৃষ্টিটাকে নানা দূরের ও কাছের জায়গায় ঘুরিয়ে আনছিলেন, নিবদ্ধদৃষ্টি হবার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছিলো না।

এমন সময় টেস্ট পরীক্ষা সাঙ্গ ক'রে মল্লিকা এলো। এবারে পড়াশুনোয় অত্যধিক মনোযোগ দেখা গেলো তার। ঘর থেকে বেরোয়ই না। অনেক রাতেও ঘরে আলো জ্বলে। এতটা মন্মথবাবুর ভালো লাগে না। পরীক্ষা নিয়ে এত প্রাণপণ করবার ওর কী দরকার—ওকে তো ডিগ্রির নিশেন উড়িয়ে চাকরি-সন্ধানের হাঁটু-ভাঙা রাস্তায় বেরোতে হবে না। কিন্তু তিনি ব্যস্ত মানুষ, বেশি ভাববারও সময় নেই।

এদিকে মল্লিকা চোখের সামনে বই খুলে চুপ ক'রে ব'সে থাকে; তারপর জোর ক'রে পড়ায় মন দেয়—বি-এ পাশ করতে পারলে তবে তো সে এম্-এ পড়বার নাম ক'রে আবার কলকাতায় যেতে পারবে। মুখে যা সম্ভব হয়নি, তা সম্ভব হয়েছে চিঠিতে। রাত্রে কতবার কুঙ্কুমের চিঠিগুলো বার ক'রে সে একটু-একটু ক'রে

ড়ে—সবাই যখন ঘুমোয়, কোনো ঘরে আলো জ্বলে না, সব পচাপ। হঠাৎ কলম টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে—আধখানা াখেই ছিঁড়ে কুচি-কুচি ক'রে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

এমনি ক'রে তার বি-এ পরীক্ষার সময় এলো, গেলো সে লকাতায়। কয়েকদিন হাতে রেখেই গেলো, গোটা কয়েক ই কলেজের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে না-পড়লেই চলবে না। বাপ ললেন: 'তুই কী হচ্ছিস বল্ তো? কেবল পড়া আর পড়া! াই যে তিনমাস থেকে গেলি, তোকে যেন চোখেই দেখলুম না।'

মল্লিকা বললে: 'বাবা, আমি কিন্তু এম্-এ পড়বো।'

বাপ বললেন: 'থাক্, আর পাশ না-করলেও চলবে।' বিশেষ জার দিয়েই বললেন কথাটা, কেননা অল্পদিন আগেই গবর্মেণ্টের ংলি-বিভাগের এক নব্য ওমরাওয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো।

মল্লিকা বললে: 'পরীক্ষার পরেও কিছুদিন থাকবো, বাবা, লকাতায়? যতদিন কলেজের সামার ভেকেশন না হয়?'

'কেন, কী করবি কলকাতায় থেকে?'

মল্লিকা একটা প্রবল আপত্তির আশঙ্কায় ছিলো, ভয়ে-ভয়ে ললে: 'এই—থাকতাম আর কী।'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা। আমার চিঠি পেয়েই চ'লে এসো কিন্তু।'

মল্লিকা এত সহজ সম্মতি পেয়ে অবাক হ'লো। কিন্তু ফরেস্ট-অফিসারের সন্ধান মিলেছিলো বর্ধমানে, কথাবার্তা মার-একটু এগোলেই কন্যা-সন্দর্শনের কথা উঠবে, তখন কলকাতা

অবশ্যতই হবে ঘটনাস্থল। মল্লিকা তো ওখানেই রইলো, মন্মথবাবু যাবেন সস্ত্রীক দু' দিনের জন্য।

মল্লিকা এ-ব্যাপারটা বিশদরূপে না-জানলেও আঁচ করেছিলো। সে জানতো যে বাবা তাকে শিগগিরই বিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন। এ-ও সে জানতো যে বাপ য়ার সম্বন্ধে মন স্থির করবেন তার বিরুদ্ধে সে কিছুতেই নিজের নির্বাচিতকে দাঁড় করাতে পারবে না। সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজয় তার হ'তেই হবে। সে-জন্য সম্মুখ-যুদ্ধে না-নামাই ভালো। আপাতত চুপচাপ, একেবারে চুপচাপ; তারপর বিপদ যখন একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, তখন নিঃশব্দে এড়িয়ে যাবে পাশ কাটিয়ে, আর তারপর···ভাবতে সাহস হয় না, বুক দুড়দুড় করে।

মল্লিকা যেদিন কলকাতায় পৌঁছলো সেদিনই কুঙ্কুমের সঙ্গে দেখা হ'লো—ঠিক বেলা সাড়ে পাঁচটায় এম্পায়ার থিয়েটারের দরজায়। এ-ক'মাসে কুঙ্কুম একটু রোগা হয়েছে, কিন্তু মুখ-চোখ হয়েছে আরো উজ্জ্বল। এই মৌশুমটা সে প্রাণ-পাত ক'রে টিউশানি করেছে, এখন তার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতায় সলিড দেড়শো টাকা। আসন্ন মাসগুলির নিতান্তই বন্ধ্যা হবার সম্ভাবনা, তবু সেই দেড়শো টাকার অঙ্কটা যখনই কুঙ্কুম চোখের সামনে ত্যাখে, তখনই তার মাথাটা একটু ট'লে ওঠে, যেমন হয় এক চুমুকে এক গেলাস ভার্মুথ খেয়ে উঠে দাঁড়ালে।

কুঙ্কুমই আগে কথা বললে: 'কেমন আছো?'

'তোমাকে তো বেশ ভালোই দেখছি।' চিঠিতে পরস্পরকে তুমি লিখতে-লিখতে সেটা সহজ হ'য়ে এসেছিলো।

দু'জনে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো, তারপর ঢুকলো একটা সিনেমায়। কুঙ্কুম আজ অর্থবান, কিন্তু মল্লিকা তাকে টিকিট কিনতে দিলে না, নিজে কিনলে। কী ছবি হচ্ছে বাইরের পোস্টরটাও একবার দেখলে না। গিয়ে দেখলো এক ক্রুক প্লে, জোচ্চোরির সঙ্গে প্রণয়ের, হত্যার সঙ্গে চুম্বন-দীর্ঘশ্বাসের রোমহর্ষক সংমিশ্রণ। তাই দেখলে ব'সে-ব'সে খানিকক্ষণ। মল্লিকার খুব খারাপও লাগলো না; বরং ভালোই লাগলো সরল ছেলেমানুষি ধরণে। যে-কোনো বাজে ছবিই হোক্, আজ তার ভালো লাগতো। কুঙ্কুম উঠে আসতে চেয়েছিলো, মল্লিকা বললে শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর শেষ পর্যন্ত, সত্যি-সত্যি তার ছবিতে মন গেলো, সত্যি-সত্যি সে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, এবং অতি মনোহর জোচ্চোর যখন তার পেশা ছেড়ে দিয়ে নিভৃত বৈজ্ঞানিকের কন্যাকে বিয়ে করলে তখন উপস্থিত অন্য সব রমণীদের মতো সে-ও একবার সুখের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

বাইরে এসে কুঙ্কুম বললে: 'পরীক্ষার পড়া কেমন তৈরি করলে?'

'পাশ ক'রে যাবো। পাশ ক'রে ইংরেজিতে এম্-এ পড়বো ঠিক করেছি।'

'চমৎকার!' কুঙ্কুম সোৎসাহে বললে। 'এ-যাত্রায় অনেক ছেলে পড়ালাম, তোমাকে পড়াতে পারলাম না এই দুঃখ ছিলো। আশা করি পরবর্তী সুযোগ হারাতে হবে না।'

পরিক্রমা

'আর দেরি করলে সুযোগ আসবে ব'লে মনে হয় না। ইতিহাসের ভূত এখনো আমার কাঁধে চেপে রয়েছে। পালাই।'

পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। তারপর কয়েকটা সোনার মতো দিন। গেলো তারা চিড়িয়াখানায়, গেলো জাদুঘরে, এমনকি ভিক্টরিয়া মেমরিয়ল-এও গেলো (ঐ বিখ্যাত প্রাসাদে কুঙ্কুমের এই প্রথম পদার্পণ), ঢাকুরিয়ার সরোবরে গেলো দু' দিন,—পরেশনাথের মন্দির আর মার্বেল প্যালেসও হয়তো বাদ দিতো না, দুঃখের বিষয় ও-দুটো কোথায় তা-ই কুঙ্কুম জানে না। এত বড়ো সহরে এমন একটা জায়গা নেই যেখানে এই দু'জনের দেখা হ'তে পারে, কিন্তু সমস্ত সহরটাই আছে।

এরই মধ্যে একদিন মল্লিকার মুখের বিবর্ণ ভাব দেখে কুঙ্কুম চমকে উঠলো। সেদিন ঠিক ছিলো তারা মাইকেল মধুসূদনের কবর দেখতে যাবে। যাবার আগে একটু চা খেয়ে নিতে হবে সেই কোনের দোকানটায়—সেটা আজকাল এতটা কেতাদুরস্ত হয়েছে যে হাঁকডাক না-ক'রে ঘণ্টা টিপতে হয়। ছোটো একটা খুপরিতে ঢুকে যখন চায়ের অপেক্ষা করছে, কুঙ্কুম জিজ্ঞেস করলে: 'তোমার কি আজ কিছু হয়েছে?'

মল্লিকা আলগোছে একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে বললে: 'না, হবে আবার কী।'

'তবে চুপ ক'রে কী ভাবছো?'

চা এলো, মল্লিকা চা ঢাললে। নিজের পেয়ালায় চিনি দিয়ে নাড়তে-নাড়তে বললে: 'আমার বাবা আসছেন।'

'এখানে!'

'মাও আসছেন।' মল্লিকা আর কিছু বললে না।

কুঙ্কুম বললে, 'ও।' খানিকক্ষণ নীরবে দু'জনে চা খেলো। তারপর কুঙ্কুম জিজ্ঞেস করলে: 'কেন আসছেন ওঁরা?'

'আমাকে ওঁরা কিছু লেখেননি—আমি খবর পেলাম।'

মল্লিকার কথা বলার ধরণে কুঙ্কুমের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে: 'কেন আসছেন?'

'আসছেন বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—তাঁদের এই কন্যার ভবিষ্যতের অনুসরণে।'

কুঙ্কুম কথাটার মানে বুঝলো, মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড গেলো তলিয়ে। কিছু বললে না, চোখ নিচু ক'রে পিরিচের গায়ে আস্তে টোকা দিতে লাগলো চামচে দিয়ে।

একটুও দ্বিধা কি লজ্জা না-ক'রে মল্লিকা বললে: 'বর্ধমানে একজনের উল্লাস পাওয়া গেছে, তাকে ধাওয়া করতেই আমার পিতা-মাতার এই দৌড়। দূতের বর্ণনায় তিনি বোধ হয় প্রসন্ন হয়েছেন, এখন চাক্ষুষ পরিচয়ের ব্যবস্থা।'

অত্যন্ত শূন্য, অবসন্ন, অর্থহীন বোধ করলো কুঙ্কুম, যেন তার সমস্ত প্রাণশক্তি শেষ হ'য়ে গেছে। আরো নিচে নামলো তার চোখ, মাথাটা প্রায় পিরিচের সঙ্গে ঠেকলো। টেবিলের উপর দুই হাতের মুঠো পর-পর উঁচু ক'রে রেখে তার উপর থুতনিটা

চেপে সে দৃষ্টিহীন চোখ তুলে মল্লিকার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'তাঁরা এসে কোথায় উঠবেন?' কোনো দরকার ছিল না জিজ্ঞেস করবার।

'জানি না—বোধ হয় কোনো হোটেলে।'

'ক'দিন থাকবেন?'

'তাঁরা তো থাকতে আসছেন না, আসছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটা হ'লেই চ'লে যাবেন। হয়-তো তাঁদের এই কন্যাটিকেও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন। তাঁরা যদি জোর করেন, আমার না-গিয়ে উপায় থাকবে না।'

কুঙ্কুম একবার ঢোঁক গিললো। নিঃস্পন্দ তার শরীর, মূর্ছার মতো।

'যদি তাঁরা জোর করেন তো যাবো ঢাকায়, কিন্তু তাঁরা আসল যেটা চান সেটা কিছুতেই হবে না আমাকে দিয়ে, কিছুতেই —কিছুতেই না', বলতে-বলতে মল্লিকা জোরে মাথা ঝেঁকে উঠলো, সেই ম্লান আলোর ঘরে ঝিলমিকিয়ে উঠলো তার লাল পাথরের দুল, লাল আভা লাগলো তার মুখে, ঝক্‌ঝক্ করছে চোখ, জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। 'তাঁরা যা চাচ্ছেন, তা হবে না এ আমি জোর ক'রেই বলবো। এখন যদি আমাকে ধ'রে নিয়েও যান, আমি আবার এসে এম্-এতে ভর্তি হ'বো।' হঠাৎ থেমে গিয়ে, সরু তীক্ষ্ণ চোখে কুঙ্কুমের দিকে তাকিয়ে বললে: 'তুমি কিছু বলছো না যে?'

'আমি? আমি কী বলবো?' কুঙ্কুমের কথা প্রায় শোনাই গেলো না।

সঙ্গে-সঙ্গে মল্লিকার বুকটা এমন ব্যথিয়ে উঠলো যেন হাড় থেকে হাড় এক্ষুনি খ'সে যাবে। একটু সে অপেক্ষা করলো, যতক্ষণ না নিঃশ্বাস নেয়াটা সহজ হ'লো। তারপর নিঃস্বর মৃত গলায় বললে: 'ও, আমি তাহ'লে ভুল বুঝেছিলাম।'

কুঙ্কুম চোখ তুলে মল্লিকার দিকে তাকালো, আর দেখতে-দেখতে সে-চোখ ঝোড়ো আকাশের মতো উতরোল উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ তার গলায় জোর ফিরে এলো, যখন সে বললে, 'না, না, ভুল বোঝোনি। কিন্তু ও-কথা এখন পর্যন্ত ভাবাও যায় না।'

মল্লিকার মুখে রক্ত ফিরে এলো। শান্তভাবে বললে, 'ভাববার সময় হয়েছে।'

'তুমি কি পাগল হয়েছো? আমার—আমি—' হঠাৎ তার মনে পড়লো যে তার দেড়শো টাকার পঁচিশ টাকাই সে এ-ক'দিনে খরচ ক'রে ফেলেছে, আর তার সব কথা হারিয়ে গেলো।

'তোমার সম্বন্ধে সবই তো জানি।'

'তুমি কি পারবে গরিব হ'তে?' কী যে বলছে কুঙ্কুম ভালো ক'রে বুঝতেও পারলে না: 'সৌখিন গরিব নয়—নতুন সাড়ি কেনবার কি পাহাড়ে যাবার টাকার অভাব নয়—সত্যিকারের গরিব—যারা—যারা—' সেই আত্মবিস্মৃত উন্মত্ত মুহূর্তেও কুঙ্কুমের মুখ দিয়ে এ-কথাটা বেরোতে পারলো না, 'যারা খেতে পায় না।' একটু থেমে বললে, 'তুমি কি জানো গরিব হওয়া কাকে বলে?'

'না, জানি না। কিন্তু আমি যদি ভয় না করি, তুমি কি ভয়ে পেছ-পা হবে?'

'ভয় তো তোমার জন্যেই!'

'ও-কথার কোনো অর্থ হয় না। তুমি যা পারবে, আমিও তা পারবো।'

'পারবে?'

'পারবো পারবো পারবো। বিশ্বাস হয় না তোমার?'

দু' হাতে মুখ ঢেকে একটু চুপ ক'রে রইলো কুঙ্কুম। হাত যখন সরালো তখন তার চোখে এসেছে এক নতুন আভা। নরম গলায় বললে: 'কিন্তু তোমার মা? তোমার বাবা? তোমার অনেকগুলি ভাই-বোন?'

'চারদিকের মাসি-পিসি ইত্যাদিকেই বা ভুলছো কেন?' মল্লিকা মুচকি হাসলো। 'তারা আছেই। তুমি আর আমিও থাকবো।'

'ধরো যদি সবাই তোমাকে পরিত্যাগ করে? সইতে পারবে?'

'এ তো অনুমানের কথা নয়, জানা কথা। শুনতে পাই', হালকা হাসির সুরে মল্লিকা বললে, 'বাবা আমার বিয়ের জন্যে কুড়ি হাজার টাকা রেখেছেন। সে-টাকাটা ওঁর স্রেফ বেঁচে যাবে। সংসারের পরীক্ষায় তোমার খাতার নম্বর আপাতত শূন্য। বাবা তার সঙ্গে আরো একটি শূন্য যোগ করবেন। আমি যদি নিজের মন এত নিশ্চিত না-জানতুম তাহ'লে হয়তো এমন আশা করতুম যে তিনি ক্ষমা করবেন।'

কুঙ্কুম অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর তার মুখে হঠাৎ একটি হাসি ফুটে উঠলো; আশ্চর্য আলোর মতো সে-হাসি। আস্তে-আস্তে বললে: 'সমস্ত জিনিসটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমরা চলেছি দু'জনেরই জীবন সৃষ্টি করতে—কিন্তু তার আগে একটু উপক্রমণিকা আছে। সেটার কথা ভেবেছো?'

'সেটা তো সহজ। একটা ছোটো ফ্ল্যাট নেবে কোনোখানে—পুরুৎঠাকুর আসবেন। ধন্য আমাদের হিন্দুধর্ম—একবার সপ্তপদী-গমন হ'য়ে গেলে তিরিশ হাজার বাপের সাধ্য নেই কিছু করতে পারেন।—তোমাকে বড়ো যে চিন্তিত দেখাচ্ছে?'

'ভাবছিলাম। সমস্তটা তুমি ভেবে দেখেছো?'

'সত্যি ক'রে বলো, তোমার কি ভয় করছে?'

'যদি করেই—তুমিই তো আছো। তবে এ-কথাটা ভুলতে পারছি না যে দারিদ্র্য জিনিসটা কোনোরকমেই রোমান্টিক নয়।'

কুঙ্কুমের কথা শেষ হবার আগেই মল্লিকার মুখ দিয়ে একটা অধৈর্যের শব্দ বেরুলো।—'ঐ কথাটা বার-বার কেন বলছো? না-হয় আমি না-ই জানি দারিদ্র্য কত কুৎসিত! না-হয় আমি দরিদ্র হ'তে চাইনে, কিন্তু তোমাকে তো চাই। তা ছাড়া, এটাই কেন ধ'রে নিচ্ছো যে আমরা দরিদ্র হ'বো? দু' জনের দুটো মাষ্টারিও কি জুটবে না? তবু যদি তোমার সংশয় থাকে এ-ও বলতে পারি যে ওতেই আমাদের যথেষ্ট হবে! তোমার ভয় নেই—বেশি টাকা আমার লাগবে না।'

কুঙ্কুমের বুকের ভিতর দিয়ে চকিতে নেমে গেলো তীব্র বিদ্যুৎ-স্রোত। রইলো সে একটু মুখ ফিরিয়ে, তারপর নিঃশব্দে রাখলো প্রসারিত হাত দিশি রেস্তোরাঁর টেবিলের সুরুয়া-চিহ্নিত কাপড়ে। নিঃশব্দে মল্লিকার ছোট হাতখানা এসে পড়লো তার উপর। তারপর মল্লিকা বললে :

'বলো, কখনো আমাকে ত্যাগ করবে না ?'

কুঙ্কুমের আঙুলগুলি ছোটো হাতখানার উপর দিয়ে উঠে এলো।

'যা-ই হোক্, যেমনই হোক্, আমাকে কখনো ত্যাগ কোরো না তুমি। আমার উপর মমতা ক'রেও কখনো ছেড়ে দিয়ো না আমাকে !'

কুঙ্কুম শক্ত ক'রে তার হাত চেপে ধ'রে বললে : 'তুমিই কি আমাকে আর ছাড়াতে পারবে !'

প্রাথমিক দু'তিন চুমুকের পর তাদের চা-পান আর অগ্রসর হয়নি, ঠাণ্ডা জল হ'য়ে গেছে। কুঙ্কুম আবার চা দিতে বললে, ইংরিজিতে থাকে উঁচু চা। রীতিমতোই উঁচু। দু'জনেই ক্ষুধিত হ'য়ে ছিলো, এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। মল্লিকা কিছু খাবো না বলতে-বলতেও যতটা খেলো সেটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

পরিশেষে বললে, 'এ যে ভোজ হ'য়ে গেলো। মধুসূদনের কবর আর দেখা হ'লো না।'

ততক্ষণে সন্ধে হ'য়ে গেছে। একটানা ঘণ্টা দুয়েক তারা ঐ ছোট্ট কুঠুরিতে বসা। এখন বেরুতে পারলে বাঁচে।

হঠাৎ মল্লিকা বললে, 'এইমাত্র একটা কথা মনে হ'লো।'

'কী ?'

মল্লিকা চুপ ক'রে আরো একটু ভাবলে, তারপর নিজের মনেই ব'লে উঠলো, 'আজই—আজই যাবো।'

'যাবে কোথায় ?' উদ্বিগ্নস্বরে কুঙ্কুম জিজ্ঞেস করলে।

'শোনো', মল্লিকা দ্রুতস্বরে বলতে লাগলো, অনেক কথা একসঙ্গে মনে আসতে থাকলে লোকে যেমন বলে, 'আমি আজ রাত্রেই ঢাকা চ'লে যাই। তাঁরা তো আমাকে কিছু বলেননি, লেখেননি, সুতরাং আমি কিছুই জানিনে, পরীক্ষা দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চলেছি ঘরে ফিরে। ওঁদের এ-যাত্রায় কলকাতায় আসাই বন্ধ করবো। আসন্ন বিপদ ঠেকাবার এ-উপায়টাই ভালো। তাঁরা যদি একবার এসেই পড়েন তাহ'লে—অপমৃত্যুর ভয় নেই, কিন্তু অপঘাত আশঙ্কা করি। তুমি কী বলো—এটাই কি ভালো হবে না ?'

'আজকেই যাবে ?'

'আজকেই, আজকেই। কে জানে কাল সকালেই যদি ওঁরা এসে পড়েন ! তাহ'লেই তো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধবে, এখন ওগুলো না-হ'লেই ভালো। পরে তো ও-সমস্ত কতই রয়েছে। যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে এটাই হবে সব চেয়ে ভালো।'

সেই রাত্রেই মল্লিকা চ'লে গেলো। মা-বাবা দু'জনেই অবাক তাকে দেখে।

—'কী রে, চ'লে এলি যে হঠাৎ ?'

'কী আর করবো। যা গরম কলকাতায়!'

'কিন্তু আমরা যাচ্ছিলাম যে! সুমি তোকে কোনো খবর পাঠায়নি?'

'তা তোমরা যাবে তো যাও না।'

মা বললেন, 'তোকেও নিয়ে যেতে হবে যে।'

মল্লিকা অবাক হ'য়ে বললে, 'আমাকে! কেন?'

মা বললেন, 'এবারে তোর বিয়ে দেবো।'

মল্লিকা হেসে বললে, 'পাগল!' ব'লে চ'লে গেলো উপরে।

মা-বাপ দু'জনে মিলে অনেক বুঝিয়ে কিছু করতে পারলেন না। মল্লিকা কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না, মল্লিকা এম্-এ পড়বে। তার জেদ দেখে বাপ ভাবলেন হয়তো জংলি সুবেদারিটা মেয়ের মনঃপূত হয়নি। মেয়ের অপছন্দটা মনে-মনে বাপের পছন্দই হ'লো। মল্লিকা তাঁর মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এটা তাঁর নিজের মত। তার উচ্চাশাকে অশ্রদ্ধা করা যায় না। ভেবে চিন্তে তিনি বর্ধমানে তার পাঠালেন দুঃখপ্রকাশ ক'রে—এদিকে সুযোগ্যতরোর অন্বেষণ চললো।

অতি দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিন, অতি মন্থর ও নির্জীব মফঃস্বল সহরের জীবন—সময় আর কাটে না। মল্লিকার সঙ্গে ছিলো ফরাসি প্রথম পাঠ, তার প্রথম পাতেই পাঠ হ'লো শেষ। মল্লিকা অগুনতি নভেল পড়লো আর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নিষ্প্রভ হ'য়ে যেতে

লাগলো। এমনি ক'রে বর্ষা এলো আকাশ ভ'রে, পাহাড় থেকে ঢল্ নামলো, নদীতে ডাকলো বান, কলকাতায় বৈকালিক বৃষ্টিপাতে স্বদেশি ফুটবল অশ্রুপাত করতে লাগলো, এভারেস্ট-আরোহীরা শেষ হাজার ফুট থেকে ফিরে আসে কি না-আসে। তারপর একদিন বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের ঝিকঝিকে দুপুরবেলায় মল্লিকা আবার যাত্রা করলো কলকাতায়।

ভর্তি হ'লো সে ইংরিজির এম্-এ ক্লাশে। এদিকে কলকাতার এক কলেজ ইংরিজির লোক নেবে, কুঙ্কুম ছিলো তারই চেষ্টায়। এমন প্রাণান্ত পরিশ্রম কোনো জিনিসের জন্যই সে এর আগে করেনি। কর্তাদের সঙ্গে ছাত্রাবস্থার কিছু সংশ্রব ছিলো তার; তাঁরা আশা দিয়েছিলেন। হ'তে-হ'তেও শেষ মুহূর্তে হ'লো না। এক নোটওয়ালা দিগ্‌গজ প্রোফেসরের 'ভূত' খাটবার প্রস্তাব এলো: প্রস্তাবটা রোমাঞ্চকর নয়, কিন্তু অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। তারই সূত্র ধ'রে পরে পাওয়া গেলো তার গোয়েন্দা-গল্পের পাব্লিশর। নোট তৈরি করা কি ছেলে পড়ানোর চাইতে যে-কোনো কাজ ভালো, যে-কোনো কাজ। এডগার ওয়ালেসকে সে ভালোবাসে না, তাকে কাটতে ছিঁড়তে কোনো কষ্টই নেই: কিন্তু ব্রাউনিঙের গায়ে একটু আঁচড় কাটতে হ'লেও তার নিজেরই রক্তপাত হবে।

পূজোর ছুটিতে ঢাকা গিয়ে মল্লিকা বুঝলো যে এইবার সময়

হয়েছে। মন্মথ সিংহ সুযোগ্যতরোকে খুঁজছিলেন, ঈশ্বরের দয়ায় ও গবর্মেণ্টের বদলির চক্রান্তে সেই দুর্লভ একেবারে সশরীরে ঢাকাতে এসেই উপস্থিত। ভদ্রলোক ট্যাক্সো আপিসের ছোটো কর্তা, অতি সুপুরুষ, বয়েস এখনো তিরিশ হয়নি। এমিনেণ্ট্‌লি ম্যারেজওয়ার্দি। বঙ্গদেশের কোনো উৎসাহী মাতা যে এখন পর্যন্ত এই মুক্ত অশ্বকে দাম্পত্যের শকটে জুড়ে ফেলেননি এতে মনে-মনে অবাকই হলেন মন্মথ ডাক্তার। মল্লিকারই ভাগ্য। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মারফৎ। জ্বর ছাড়লো, কিন্তু ডাক্তার ছাড়লো না। ছোটো সহরে আলাপ-পরিচয় বজায় রাখা শক্ত নয়, দেখাশোনা আনাগোনার সময় কি উপলক্ষ্যের অভাব তো ঘটেই না, উপরন্তু কথাপ্রসঙ্গে এম্‌-এ-পাঠকারিণী কন্যাকে মাঝে-মাঝে অবতীর্ণ করা সহজ হয়। কন্যার অবর্তমানে কন্যার পিতামাতার কোর্টশিপে যতটা সম্ভব এগিয়ে আছে, এখন মল্লিকা এলেই হয়।

মল্লিকা এলো; এসে অল্প সময়েই বুঝতে পারলো যে সঙ্কট আসন্ন। শৈলেন সরকারকে বাবা কিছুতেই ফসকাতে দেবেন না। চা-পর্বের ঘন-ঘন আয়োজনে হাঁপিয়ে উঠলো। মল্লিকা চা ঢেলে দেয়, চা খায়, হেসে গল্প করে। বাইরে কোনোরকম বৈরীভাব প্রকাশ পেলো না তার। বাপ তাকে লক্ষ্য ক'রে খুসি হলেন। মনে-মনে ভাবলেন: একে আমার মেয়ের মনে ধরেছে। না-ধ'রে পারে!

ছুটি যখন শেষ হ'য়ে এলো, মেয়েকে একদিন নিভৃতে ডেকে

বললেন: 'শৈলেন সরকার আমার কাছে তোমাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতুম না; কিন্তু তোমার বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে—তোমাকে কিছুই না-ব'লে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলা আমার ভালো লাগলো না।'

মল্লিকা চুপ ক'রে রইলো।

'তোমাকে বলতে বাধা নেই যে আমার ও তোমার মা-র এটা খুব মনঃপূত হয়েছে। আশা করি তোমারও তা-ই।'

মল্লিকা এবারেও কিছু বললে না।

'অবিশ্যি শৈলেন সম্বন্ধে কোনো মেয়ের মত জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য ব'লে মনে হয় আমার। তুমি কিছু না-বললেও তোমার মন আমি বুঝতে পেরেছি। অঘ্রান শৈলেনের জন্ম-মাস, মাঘ মাসে তোমাদের বিয়ে হবে। তুমি এখন আবার কলকাতায় যাবে, না থেকেই যাবে?'

মল্লিকা বললে: 'কলকাতায় যাবো।'

'যেতে চাও আমি বাধা দেবো না, কিন্তু বিয়ের পরে তোমার পড়া চালানো সম্ভব হবে কি? অবিশ্যি লেখাপাড়ায় তোমার উৎসাহ আমার খুব ভালো লাগে, শৈলেনও বলেছেন যে তুমি যদি নিতান্তই চাও তোমাকে পড়া ছাড়তে বলবেন না। কিন্তু আমার মতে ওটা চালাবার চেষ্টা না-করাই ভালো।'

'আর-কিছু বলবে, বাবা?'

'আশা করি জীবনে তুমি সুখী হবে', ব'লে, মন্মথ ডাক্তার

তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেলেন। তিনি অতিশয় ব্যস্ত মানুষ, একজনের সঙ্গে একটানা বেশি কথা বলবার সময় হয় না।

কলকাতায় এসে দিনগুলি কাটতে লাগলো যেন জ্বরের ঘোরে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা যায় না। আর কিছু নেই বলবার কি ভাববার। নীরন্ধ্র গোপনতা বজায় রেখে সব ঠিক ক'রে ফেললো। কী ক'রে পারলো? তারা জানে না। সমস্ত জিনিসটা যেন স্বপ্ন। কুঙ্কুম কখনো ভাবেনি এত পারবে, এত করবে। সে নিলে কালিঘাটের ছোট্ট ফ্ল্যাট, গোটা কুড়ি টাকা খরচ হ'লো অনুষ্ঠানের আয়োজনে, মাঘ মাসের প্রথম দিকেই এক সন্ধেবেলা সেই দক্ষিণের ছোট বারান্দায় এক মূর্খ ব্রাহ্মণের কৃপায় তারা হ'লো স্বামী-স্ত্রী। উভয়পক্ষের দু' চারজন বন্ধু উপস্থিত ছিলো, আর ছিলো প্রশান্ত আর বরুণা।

'ওয়েডিং উইদাউট টিয়র্স', হেসে বলেছিলো কুঙ্কুম, প্রচলিত হিন্দুবিবাহের ঢাক ঢোল জগঝম্প ও ওজনহীন ভোজনের কথা ভেবে।

কিন্তু খবরটা রাষ্ট্র হবার সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকের অশ্রুবর্ষণ একেবারে অশ্রুবন্যা হ'য়ে উঠলো। মল্লিকা ছোট্ট একটা চিঠি লিখেছিলো বাবাকে, সেটা ফেরৎ এলো, 'মালিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত'। মন্মথ ডাক্তার সে-চিঠি খোলেননি। তিনি প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন ইহজীবনে মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর রাখবেন না। মল্লিকা আর-একটা চিঠি লিখলো, অনেক কথাই লিখলো তাতে। সে-চিঠিও ফেরৎ এলো। তারপর মল্লিকা আর লিখলো না।

এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তাদের, এই বাড়িতে তারা আছে। তিনমাস কেটেছে। এ যেন কোন্ অপরূপ জন্মান্তর। জীবনের দুঃখ এড়াবার জন্য যত কঠিন তপস্যা মানুষের, এ বুঝি সেই সমস্ত সঞ্চিত তপস্যার ফল। দুঃখ নেই। কারো কথা মনে পড়ে না মল্লিকার—তার মা কি বাবা কি অনেকগুলি ভাই-বোনের। মনে যদি বা পড়ে, তাতে কোনো ব্যথা নেই, কোনো আশা নেই। তারা ছেড়েছে, সে-ও ছেড়েছে। এমনি হবে, সে প্রথম থেকেই জানতো। সে অবাক হয়নি। সে দুঃখিত হয়নি। একটি অভিযোগের কথা বলেনি কখনো। সত্যি বলতে, অন্য-কোনো কথা ভাববার সময়ই নেই তার, অন্য যে-কোনো কথা তার মনের উপরকার স্তরে একবার ঝিলকিয়েই মিলিয়ে যায়। ভ'রে আছে সে, ভ'রে আছে কূল ছাপিয়ে, প্রতিদিনের জীবনের সুখদুঃখের ঘূর্নি ছাড়িয়ে। তাকে আর কুঙ্কুমকে নিয়ে এক নতুন পৃথিবী, এক নতুন জীবন।

মল্লিকা ভেবেছিলো, বিয়ের পরেই একটা ইস্কুলমাষ্টারি নেবে। এম্-এ পড়া সে খুসি হ'য়েই ছাড়লো, কিন্তু কুঙ্কুম তাকে মাষ্টারি

নিতে দিলে না কিছুতেই, বললে : ‘পাগল ! এর জন্যে তোমাকে বিয়ে করলাম নাকি ?’

মল্লিকা বললে : ‘বাঃ, দু’জনে মিলে কাজ করবো এই না কথা ছিলো !’

কুঙ্কুম বললে : ‘আপাতত থাক্ তো। দোহাই তোমার, রাজা হবার পরেই আমাকে বনবাসে পাঠিয়ো না।’

এর পরে কিছু কথা-কাটাকাটি হ’লো, কিন্তু কুঙ্কুম নাছোড়-বান্দা। মল্লিকাকে কোনোরকম চেষ্টাই করতে দিলে না। এর মধ্যে তার কোনো গর্ব ছিলো না; মল্লিকার সঙ্গ থেকে অল্প সময়ের জন্যেও বঞ্চিত হবার অনিচ্ছা ছাড়া আর-কিছুই ছিলো না। সমস্ত জীবন বাজি রেখে সে যে বিয়ে করলো তা কি বিকেলে বাড়ি ফিরে মল্লিকাকে অনুপস্থিত দেখতে ? আগে মিটুক চিরকালের তৃষ্ণা, অন্নের ব্যবস্থা একরকম হবেই। নিতান্ত না-ই হয় তো তখন দেখা যাবে।

দুপুরবেলা কুঙ্কুম প্রায়ই বেরিয়ে যায়। যায় এখানে, যায় ওখানে, রোদে-পোড়া চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। টাকা শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে এটা প্রায় জানা কথাই, তবু চেষ্টা না-করলেই মনে হয় বুঝি মস্ত কিছু ফস্‌কালো। মল্লিকা শুয়ে থাকে পাটি পেতে; ঘুমোয় না, ঘুমোতে পারে না। এই বুঝি কুঙ্কুম ফিরে এলো, তার রক্তে কেবল এই সুর। শুয়ে-শুয়ে এ-বই

ও-বইয়ের পাতা উল্টোয়, তাদের অতি ক্ষুদ্র গৃহের অতি স্বল্প সজ্জার মধ্যেই ছোটখাটো অদল-বদল করবার চেষ্টা করে, হয়-তো রাস্তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো জানলায় তবু কুঙ্কুম ফেরে না, তখন স্টোভ ধরিয়ে বসলো নতুন রকমের কোনো খাবার তৈরি করতে।

আজও কুঙ্কুম বেরিয়েছে। মল্লিকা খানিকক্ষণ শুয়ে-শুয়ে পড়েছে আন্তন চেহভ-এর ছোটো গল্পের বই—কুঙ্কুম এক বন্ধুর থেকে ধার এনেছে! তারপর উঠে বসেছে ছুঁচ সুতো কাঁচি আর এক টুকরো ছিটের কাপড় নিয়ে। আজ যেতে হবে বাবলির জন্মদিনে, একটা ব্লাউজ সেলাই করবে। সকলেই যাকে পরিত্যাগ করেছে, কলকাতায় ফিরিওয়ালারা তাকেও পরিত্যাগ করে না; অখ্যাততম কোনের দুর্গমতম তিন-তলাতে তাদের আনাগোনা। তারই একজনের থেকে এই একগজ ভয়েল সে রেখেছে—দাম সাড়ে ন' আনা, এখন বাকি। হাতে তার আছে ঠিক একটা টাকা আছে, তা থেকে সাড়ে-ন' আনা খরচ ক'রে ফেলা কি ভালো? অবিশ্যি তার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ও গোপন সেভিংস ব্যাঙ্কে সাড়ে-ন' আনার কিছু বেশিই আছে বোধ করি, কিন্তু সে-পয়সা সে সহজে ছোঁবে না। ব্যাঙ্কটি হচ্ছে লাল রঙের একটা সিগারেটের কৌটো, তাতে বাজার-ফিরতি দু' একটা পয়সা আর সুবিধে পেলেই নানা জাতীয় ক্ষুদ্র মুদ্রা সে ফেলে রাখে। তাম্ররাশিতে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আস্ত একটা রূপোর টাকাও আছে, সেটার অস্তিত্ব মল্লিকাও প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। দুটো চারটে পয়সার এই

অবলুপ্তিতে কোনোখানেই আঁচড় লাগে না, এবং তারাই যখন একদিন আকস্মিক অনটনের গর্ত ভর্তি ক'রে দেয়, তখন খুসির সীমা থাকে না। তাদের যুগল-জীবনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই মল্লিকা এই ইকনমিক পলিসির অবতারণা করেছিলো। কুঙ্কুম জানতোই না, একদিন নিতান্ত দৈবক্রমে লাল কৌটো আবিষ্কার ক'রে ফেলে রোমাঞ্চিত হ'লো। নির্ভয়েই ঘোষণা করলে এই ঐশ্বর্যে তার অধিকার। কিছু বাকবিতণ্ডার পর স্থির হ'লো, এই ব্যাঙ্কে কুঙ্কুমের আট আনা পর্য্যন্ত ক্রেডিট। কিন্তু আট আনা নিলে আস্ত টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে—সুদের হার একটু বেশিই যেন মনে হয়। যেদিন সকালে বাজারের পয়সা থাকে না, কি থাকে না কুঙ্কুমের ট্র্যামের ভাড়া, সেই অদৃশ্য উৎস থেকে যা দরকার ঠিক এসে পড়ে। কুঙ্কুম আদর্শ বিবেকবানের মতো নিকটতম সুযোগেই ঋণ শোধ করে, কিন্তু মল্লিকার হিসেবে সমস্তটা শোধ হয় না। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক গুরুতর কলহ হ'য়ে গেছে। তাহ'লেও, উপরন্তু ঋণের আরজি পেশ করলে সেটা নামঞ্জুর হয় না। এ-কথা মল্লিকার মুখে কখনোই শোনা যায় না যে পয়সা নেই। এতদিনে এমন হয়েছে যে সেই লাল কৌটোর উপর কুঙ্কুমের প্রায় একটা অলৌকিক বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে, যাকে বলে মিস্‌টিক ফেইথ্। প্রতিদিনের ভাবনায় সে আর বিব্রতই হয় না; অন্য সব ফুরোবে, ফুরোবে না মল্লিকার লাল কৌটো।

ভয়েলের টুকরোটা পাটির উপর টান ক'রে পেতে মল্লিকা একটু তাকিয়ে রইলো। কমলালেবু রঙের উপর অত্যাধুনিক ধরণে কোনওয়ালা কালো-কালো নক্সা আঁকা। খুব পছন্দ হয়েছে কাপড়টা। নিজের বাহুর উপর কাপড়টা একবার গোল ক'রে জড়িয়ে ধ'রে দেখলো, ভালোই লাগলো দেখতে। তারপর হাঁটুতে থুতনি চেপে ব'সে কাঁচি চালিয়ে গেলো কাপড়টার গায়ে। আজকাল ব্লাউজে আর পুরো একগজ কাপড় লাগে না--যে-টুকরো-গুলো বেরোয় সেগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে অন্য-কিছু হয়তো হ'তে পারে। টুকরোগুলো তুলে রেখে দিলে একটা কাগজের বাক্সে। একটা কল থাকলে হু-হু ক'রে দু' মিনিটে হ'য়ে যেতো। থাক্গে, হাতেই বা আর কতক্ষণ লাগবে। হাঁটুর উপর কাপড়টা রেখে দ্রুতহাতে ছুঁচের ফোঁড় তুলতে লাগলো, নিবিষ্ট চোখের কোলে ফুটলো অতি সূক্ষ্ম রেখা। সুবিধে হ'লেই সেলাইয়ের কল কিনবে একটা। ঈশ্বরের দয়ায় ও আধুনিক ফ্যাশানের মহিমায় মেয়েদের জামায় এত অল্প কাপড় লাগে যে নানা রঙের নানা ছাঁদের জামা পরবার শখ সহজেই মেটানো যায়। আজকাল কাপড়ও বেরিয়েছে অফুরন্ত রকমের, দিন-দিনই শস্তা হচ্ছে, তাছাড়া। বর্তমানে তার যে-কটা জামা আছে সবই আদি যুগের, এখন একটাও পছন্দ হয় না। সেবার কলকাতায় আসবার সময় তার বাক্সে যে-ক'টা জামাকাপড় এসেছিলো, তার নবজীবনে

বাপ-মায়ের অনভিপ্রেত আশীর্বাদ-রূপে সেগুলোই টিঁকে আছে; সুখের বিষয়, দু' একটা সৌখিনগোছের সাড়িও ছিলো তার মধ্যে। খয়েরি রঙের একখানা জামদানি ঢাকাই সাড়ি, বর্তমানে ওখানাই তার সর্বাধিক প্রিয়, এত বেশি প্রিয় যে পরতেই চায় না। আজ বাবলির জন্মদিনে যেতে ওখানা পরবে। তার সঙ্গে ব্লাউজটা মানাবে ভালো।

সুতো গেলো ফুরিয়ে; ছুঁচের উল্টোদিকটা ঠোঁটে চেপে ধ'রে জিনিসটা একটু উল্টে-পাল্টে দেখলো। সুন্দর হবে। আবার সুতো পরিয়ে পাটিতে পা ছড়িয়ে দিলে; এই তো দেখতে-দেখতে হ'য়ে যাবে। বরুণা-বৌদির ওখানে ওরা সবাই আসবে নিশ্চয়ই। সুমি-দি, আঁখি-পাখিরা—কতদিন ওদের সঙ্গে দেখা নাই। অবিশ্যি সেজন্য কিছুমাত্র আপশোষ নেই তার, একবার মনেও পড়ে না ওদের কথা। আশ্চর্য, কারো কথাই তার মনে পড়ে না! যে-শাস্তি ওরা সকলে মিলে দিলে, সেটা তার পক্ষে কোনো শাস্তিই হ'লো না। বরঞ্চ এই নির্জনতাই সব চেয়ে ভালো, এই অফুরন্ত স্বাধীনতা। তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সুখী করবার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাই তো এ-ই। সেদিন হঠাৎ সুমি-দি এসেছিলো। সে আশা করেনি। বেশি ভালোও লাগেনি প্রথমটায়। কিন্তু কথাবার্তা সুমি-দি মন্দ বললে না। কুঙ্কুম বাড়ি ছিলো না, তার কথা অনেক জিজ্ঞেস করলে। যে-সমস্যা স্পষ্টতই এখন তাদের জীবনে প্রধান, সে-কথাও উঠলো। প্রসঙ্গটাই লজ্জার, মল্লিকা এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। তবু সুমি-দি গায়ে প'ড়েই বললে, 'দাদা তো

ইচ্ছে করলেই পারে, দাদাকে বলবো।' প্রশান্ত-দা অবিশ্যি বিয়ের পরেই কুঙ্কুমকে বলেছিলেন চেষ্টা করবেন। কুঙ্কুম মুখ ফুটে আর-কিছু বলেনি। কাল প্রশান্ত-দার আফিসে গিয়েছিলো, চা খেয়ে গল্প ক'রে চ'লে এসেছে। যা-ই হোক্। অনেক উপায়েই বাঁচা যায়, আর শুধু বেঁচে থাকাটাই তো সব কথা নয়। তাছাড়া, জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজন নিয়েও বেশি চিন্তা করবার সময় আপাতত তাদের নেই।

মল্লিকার একবার ইচ্ছে হ'লো, সেলাইটা এখন একটু রেখে দেয়; কিন্তু বিকেলের আগেই এটা প্রস্তুত হওয়া তো দরকার। যে-কোনো সময়ে কুঙ্কুম হয়তো এসে পড়বে, সে এলে আর সেলাই হবে না। মাথা নিচু ক'রে একমনে লাগলো কাজে, শেষ ক'রে তবে উঠলো। বাড়তি সুতোটুকু দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে জামাটা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দেয়ালে টাঙানো সেই গোল আয়নার কাছে গিয়ে প'রে দেখলো। বেশ হয়েছে। খুলে রেখে দিলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে। কুঙ্কুম তো এখন ফিরলেই পারে। মল্লিকা খুলে দিলে পশ্চিমের জানলাটা, আড় হ'য়ে রোদ পড়লো মেঝেতে। ক'টা বাজলো? রাস্তায় এখনো দগ্‌দগে রোদ, এপ্রিলের আকাশের নিচে সহরটার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে উঠতে চাইছে। এক-এক সময় সত্যি বড়ো গরম হয়। এতক্ষণ সেলাইয়ে মগ্ন ছিলো ব'লে টের পায়নি। এমনিও, গরম সম্বন্ধে তার বোধটা কিছু ভোঁতা।

কিন্তু তিনটে এতক্ষণে না-বেজেই পারে না। নিশ্চিত জানবার উপায় নেই। কুঙ্কুমের পঠদ্দশার অন্যতম সম্পত্তি আছে একটি ওয়েস্ট এণ্ড্ কোম্পানির ক্যাভাল্রি হাত-ঘড়ি, কুঙ্কুম গেছে সেটি নিয়ে বেরিয়ে। বাড়িতে দ্বিতীয় ঘড়িজাতীয় বস্তু নেই, থাকবার দরকারও নেই। তবু ঘড়িটা একটা অভ্যেস, না-হ'লে অসুবিধে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ কোনোখানে যাওয়া-আসার দরকার না-থাকলে ঘড়ির অভাবে কারো দিন কাটেনি, এমন শোনো যায়নি। তবু হাতের কাছে ও-জিনিসটা না-থাকলেই ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, ভাবটা এই যেন এগারোটা বাজতে না-দেখলে রাত্রে শুতে যেতে নেই। কুঙ্কুম যখন ফেরবার তখনই ফিরবে, মল্লিকা ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকলে যে অর্দ্ধ-মিনিটও আগে ফিরবে তা নয়। তবু—ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে পারাটাই একটা সান্ত্বনা। মল্লিকা বলেছিলো, আজ আর না-ই বেরুলে, রোজই একবার বলে ও-কথা, রোজই কুঙ্কুম দ্বিধা করে, তারপর বেরিয়ে যায়। আজ অবিশ্যি এক নামজাদা পাব্লিশরের ওখানে যাবার কথা: তাদের ইচ্ছে হয়েছে কতগুলো বিদেশী গল্প বাঙলায় বের করবে, কুঙ্কুমকে দিয়ে তর্জমার কাজটা করিয়ে নিতে চায়। কাজটা ভালো, কথাবার্তাও একরকম হ'য়ে গেছে, এখন শেষ মুহূর্তে কোনো অঘটন না ঘটে। মল্লিকা ব'লে দিয়েছিলো—ওখান থেকে অন্য কোথাও আর যেয়ো না কিন্তু, সোজা বাড়ি চ'লে এসো। এখনো ফেরে না কেন?

ভাবতে-ভাবতেই বাইরের ঘরের দরজায় অতি মৃদু টোকা

পড়লো। লাফিয়ে উঠলো মল্লিকার বুক, ছুটে গিয়ে খুলে দিলে দরজা। রোদে ক্লান্ত চেহারা নিয়ে কুঙ্কুম ঘরে ঢুকলো। তার হাতে গোটা দু' তিন পুঁটলি, ব্রাউন-পেপারে জড়ানো।

'বাবাঃ! কত দেরি করলে!'

'দেরি! একটা মুহূর্তও অপব্যয় করিনি।'

ভিতরের ঘরটায় ঢুকে কুঙ্কুম হাতের পুঁটলিগুলো নামিয়ে রেখে ব'সে পড়লো পাটিতে পা ছড়িয়ে। তালপাখাটা তুলে নিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিঠে হাওয়া করতে-করতে বললে: 'উঃ! একটা ইলেকট্রিক পাখা না-হ'লেই আর চলছে না। ভাড়া ক'রে তো আনতেই চেয়েছিলুম, তোমার জন্যেই পারলুম না। এবার আমি আর তোমার কথা শুনবো না ব'লে দিচ্ছি।'

মুচকি হেসে বললে মল্লিকা: 'অত জিনিস কী আনলে?'

'অনেক এনেছি।'

মল্লিকা পুঁটলিগুলো খুলে ফেললো। দু'খানা তোয়ালে, একটা ফাউন্টেন পেনের কালি, এয়ার মেইল রাইটিং প্যাড একটা, সিগারেট একটিন, আর ছবিওয়ালা ইংরিজি বই একখানা, শিশুদের কবিতা। বইখানাই আগে হাতে তুলে নিয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে: 'বাবলির জন্যে এনেছো বুঝি? বেশ করেছো।'

'নিজেদের জন্যেও উপহার আনতে ভুলিনি। আমার জন্যে ঐ সিগারেটের কৌটো, আর তোমার জন্যে—'

বিশেষ-কিছু নয়, ছোট্ট সেন্টের শিশি। ও-জিনিসটা মল্লিকা

লক্ষ্যই করেনি, দেখতে পেয়ে মুখ লাল ক'রে বললে: 'ছি-ছি, ওটা কেন আনতে গেলে?'

'কেন, কী হয়েছে তাতে?'

চকচকে নীল শিশিটার দিকে আর-একবার তাকিয়ে মল্লিকা বললে: 'কী দরকার ছিলো ওর?'

'দরকার কি আমার সিগারেটেরই ছিলো! ইচ্ছে হ'লো, নিয়ে এলাম। এসেন্স্‌টার দাম বেশি নয়। রাগ করলে?'

হেসে মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বললে মল্লিকা: 'বুঝতে পেরেছি; রাজেন রক্ষিত টাকা দিয়েছে বুঝি?'

কুঙ্কুম ভেবে এসেছিলো, অনেক ভণিতা ক'রে আস্তে আস্তে সমস্তটা কাহিনী বলবে। হ'লো না। খবরের কাগজের রিপোর্টের মতো বলতে হ'লো: 'দিয়েছে। পঞ্চাশ টাকা।'

'যাক্‌, বাড়ি-ভাড়াটা এবারে দেয়া হ'য়ে যাবে।'

'আমি গিয়ে বলতেই কাগজে সই করিয়ে নিয়ে দিলে। আশ্চর্য! ছাখো, পৃথিবীতে ভালো লোকও আছে।'

'তোমাকে কাজের দাম দিয়েছে তার মধ্যে অসাধারণ ভালোত্বটা তুমি দেখলে কোথায়?'

'কী যে বলো! প্রাপ্য টাকাই কি আর সবাই সহজে দেয়! আদায় করতে প্রাণ বেরিয়ে যায় না! তাও তো এটা আগাম দিয়েছে। তর্জমাগুলো শেষ ক'রে দিলেই আর একশো টাকা দেবে।' সুখে, শান্তিতে, শারীরিক আরামে কুঙ্কুম মল্লিকার মাথার-গন্ধ-ভরা বালিসটার উপর মুখ চেপে শুয়ে পড়লো।

'দেড়শো দেবে বুঝি সবসুদ্ধ?'

'বেশ ভালোই—না? ত্যাখো, আমি প্রথমদিন দেড়শোই চেয়েছিলাম, রাজেনবাবু এক কথাতেই রাজি হ'য়ে গেলেন। এখন ভেবে দেখছি খাটনি নেহাৎ মন্দ না। দু'শো চাইলে হয়তো দু'শোই পেতুম। তা-ই চাওয়া উচিত ছিলো, না? বড্ড ভুল করেছি।'

'চাইলেই কি পেতে?'

'রাজেনবাবু হয়তো দু'শোটাকাই দেবেন ভেবে রেখেছিলেন—আমি না-চাইলে গায়ে প'ড়ে তো আর দিতে পারেন না। আমার বোকামির জন্যে পঞ্চাশটা টাকা লোকসান হ'য়ে গেলো। বাস্তবিক, আমি মোটে দর হাঁকতে পারিনে—এইজন্যই কোনোদিন আমার কিছু হবে না। আজকেও ত্যাখো, পঞ্চাশটাকা আগাম চাইলুম, তক্ষুনি দিয়ে দিলেন। রাজেনবাবু বড়ো ভালো লোক।'

'আমার মনে হয় কি জানো? রাজেনবাবু ঠিক দেড়শো টাকাই দিতেন, সেইজন্য একবারেই তোমার কথায় রাজি হলেন। তুমি বেশি না ব'লে ভালোই করেছো, অমন ভালো লোকের সঙ্গে দরদস্তুর করার ভাবটা ভালো দেখাতো না।'

'সে তো ঠিক কথাই,' কুঙ্কুম উৎসাহিত স্বরে বলে' উঠলো। 'ভদ্রলোকের মধ্যে এইরকম ব্যবহারই সঙ্গত। তাহ'লে আমি ভালোই করেছি? ত্যাখো: ক'দিন থেকেই এ কথাটা ভেবে আমি মনে একটুও শান্তি পাচ্ছিলাম না।'

'পাগল! এর বেশি আবার কী দেবে! আর পেমেণ্ট এত চমৎকার।'

'নিশ্চয়ই! এটাও তো ফ্যাল্‌না কথা নয়। তাহ'লে সুরু ক'রে দিই লিখতে। প্রথমে মোপাসাঁর একটা করবো। তুমিও তো কিছু-কিছু করতে পারো—দু'জনে মিলে করলে কত শিগগির হ'য়ে যাবে।'

'করবো। আমাকে টাকার আদ্ধেক দেবে তো?'

উৎসাহের বেগ সামলাতে না-পেরে কুঙ্কুম উঠেই বসলো।—'তাহ'লে এসো এখনই আরম্ভ ক'রে দিই। নিয়ে এসো তো গোল্যাঙ্কজ্ কোম্পানির সেই বইখানা—একটু পাতা উল্টিয়ে দেখি।'

'তার আগে চা খেয়ে নিলে ভালো করতে না?'

'না, চা আরো একটু পরে খাবো। এসো না একটু শুই।'

ব'লেই কুঙ্কুম ফের শুয়ে পড়লো, সেই একই বালিসে মাথা রেখে মল্লিকাও শুলো। কুঙ্কুম বললে: 'আপাতত কোনো ভাবনা নেই। একেবারে সোয়েল!'

'বাড়ি-ভাড়া তিরিশটাকা দিতে হবে, বললে মল্লিকা।'

'সেটা বাদ দিয়েই বলছি।'

'আজ কত খরচ করছো?'

'কত আর—সাড়ে-চারটাকার মতো, পাঁচটাকাই ধরো। রইলো পনেরো টাকা। কম নাকি!'

'মুদি সেদিন তাগাদা ক'রে গেছে।'

'ওঃ, তা হোক্ তা হোক্—তেমনি আরো একশো টাকা হাতেও আছে। কালকে একটা ভোজ লাগিয়ে দেবো।'

'কাকে বলবে ?'

'বলবো আবার কাকে ? তুমি আর আমি, তুমি আর আমি।'

এর পর আলাপটা অন্য খাতে প্রবাহিত হ'লো, এবং আরো খানিকক্ষণ পরে দু' জনেই পড়লো ঘুমিয়ে।

ঘুম ভাঙলো দরজায় করাঘাতের শব্দে। একসঙ্গে দু'জনেই জেগে উঠলো। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে লম্বা রোদ প্রায় উল্টোদিকের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। বিকেল প'ড়ে এসেছে, ঝিরঝিরিয়ে বইছে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা-হ'য়ে-আসা হাওয়া। ইস্—কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তারা !

কুস্কুম উঠে গেলো লাল চোখ নিয়ে শিথিল পায়ে দরজা খুলতে। শ্বেতাঙ্গ বেশে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত। তাকে দেখেই হেসে বললে, 'আসতে পারি ?'

'আস্থন, আস্থন।'

'ঘুমুচ্ছিলে ?'

'হ্যাঁ—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' হঠাৎ এই ঘুম-ভাঙা অস্পষ্ট মন নিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে কী আলাপ করবে ভেবে পেলো না কুস্কুম। তাড়াতাড়ি বললে : 'চলুন ও-ঘরে।'

ও-ঘর থেকে মল্লিকা শুনতে পেয়েছিলো প্রশান্তর কণ্ঠস্বর, শুনেই অতি ক্ষিপ্রহাতে সাড়িটা সামলে চুলটা ঠিক ক'রে নিয়েছিলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে বললে: 'এই যে, প্রশান্ত-দা। এই সময়ে যে?'

'অভ্যর্থনাটা খুব জমকালো শোনাচ্ছে না। তোমাদের এই দ্বৈতলোকে ঢুকতেই ভয় করে।'

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠে মল্লিকা বললে: 'এসো, এসো। সোজা আপিস থেকে আসছো বুঝি?'

'মনে হ'লো তোমাদের একবার দেখে যাই।'

খুসিতে উছলিয়ে উঠলো মল্লিকা। 'চলো বারান্দায় গিয়ে বসি। আমি চা করবো। কী খাবে, প্রশান্ত-দা, চায়ের সঙ্গে?'

'তোমার ঐ হাতের চা পেলেই আপাতত ধন্য হ'বো, তবে উপরন্তু যা-কিছু দাও তা-ই যথাস্থানে পৌঁছবে।—কিন্তু তোমাদের অসুবিধে করছি না তো কোনোরকম? আইন অনুসারে এখন আমার চায়ের দরকার নেই।'

কুঙ্কুম বললে: 'চা এখন এমনিতেই হ'তো—আমাদের বিকেলে চা খাওয়া এখনো হয়নি।'

মল্লিকা বললে, কুঙ্কুমের আলুথালু চেহারার দিকে তাকিয়ে: 'তুমি চট্ ক'রে স্নান সেরে এসো না এই ফাঁকে। বাথরুমে কাপড় আছে।'

কুঙ্কুম খুসি হ'য়েই চ'লে গেলো স্নান করতে। সে ঠিক নিজের সুরটা খুঁজে পাচ্ছিলো না—দিনে ঘুমিয়ে উঠলে অনেক সময়

যেমন হয়। বৈকালিক স্নানের মতো মনকে সজীব ক'রে তোলে অল্প জিনিসই।

সেই দক্ষিণের বারান্দায়, মল্লিকা স্টোভ ধরিয়ে করছে চায়ের আয়োজন, আর প্রশান্ত বসেছে দরজার কপাটে ঠেসান দিয়ে হাঁটু উঁচু ক'রে। মল্লিকা ছিপছিপে মেয়ে, গায়ের রঙটা আরো অগুনতি বাঙালি মেয়ের মতোই ফিকে ব্রাউন, তবে তাতে ভারি সুন্দর লালচে আভা আছে। গলায় অতি সরু একটি হার দেখা যায় কি যায় না, মাঝে-মাঝে চিকচিকিয়ে উঠছে পড়ন্ত রোদে উঠতে-বসতে। এক হাতে একটি রুলির উপরে সিঁদুরে-মাখা শাঁখা—বিয়ের পর এক বছর পর্যন্ত পরবার নিয়ম। নিয়মটা মল্লিকা লঙ্ঘন করেনি, কেননা অনায়াসেই লঙ্ঘন করতে পারতো। অন্য হাতের মণিবন্ধ আঁকড়ে রয়েছে লোহার বালা, তাতে দুটো সেফ্‌টিপিন আটকানো। সিঁদুরের ফোঁটা আছে কপালে, নিরীক্ষণ করলে কিছু-কিছু রক্তিম চূর্ণ নাসিকার ঢালু অংশেও আবিষ্কার করা যাবে। পূর্বকালে মল্লিকা সিঁথি করতো বাঁদিকে, বিয়ের পরে সিন্দুর-বিন্দুর খাতিরে চিরাচরিত প্রথায় মাঝখান দিয়ে করতে হয়, অসম্বৃত মুহূর্তে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে বামপার্শ্বের অধুনালুপ্ত ভেদরেখাটা এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। কুচকুচে কালো চুল আঁকাবাঁকা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এলোখোঁপায় অর্দ্ধ-শাসিত। আজ বিকেলে সে সাড়িটি পরেছে ফিকে নীল রঙের—রঙটা তার নিজের

হাতে ছোপানো—মাথায় দেয়নি কাপড় তুলে—বিবাহিত মেয়ের পক্ষে ঐ অবশ্যকর্তব্যটা অনায়াসেই অস্বীকার করতে পেরেছে সে। ওটা তার ভালোই লাগে না, এবং অভ্যেস করতে বাধ্যও হয়নি, যদিও বেরোবার সময় প্রথাটা মানতেই হয়। পায়ে চটি নেই, গ্রীষ্মকালে স্বগৃহে ব'সে জুতোটাকে সে উৎপাতই মনে করে। কানে কিছু নেই, ইচ্ছে ক'রেই পরেনি। তার আদিজীবনের কিছু অলঙ্কার ছিলো তার অঙ্গে, যখন সে শেষবার ঢাকা ছাড়লো। সেগুলো র'য়েই গেছে। তাই থেকে হার আর রুলিটা সে পরে, অন্যগুলো রেখে দিয়েছে দৈনন্দিন জীবনের বাইরে, বিশেষ উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য ক'রে।

প্রশান্ত খানিকক্ষণ মল্লিকার নিঃশব্দে কাজ করার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছিস, মল্লি?'

'খুব ভালো আছি', বলতে মল্লিকার বুকের ভিতরটা ছল্‌ছলিয়ে উঠলো। এত সুখ সে কেমন ক'রে জানাবে, এত সুখ সে সইবে কেমন ক'রে? এত সুখ সে কখনো কি ভেবেছিলো!

এমন স্বরে বলা হ'লো কথাটা, আর এমন একটি আভা ফুটলো মল্লিকার আনত মুখে যে প্রশান্ত তক্ষুনি বুঝতে পারলো যে কথাটা অতি সরলভাবেই সত্য।

তিনটে ডিম ভেঙে কাঁটা দিয়ে ফ্যাটাতে-ফ্যাটাতে মল্লিকা চোখ তুলে বললে: 'তোমার ওখানে যাবো ব'লে আজ সকাল থেকেই আমরা তোড়জোড় লাগিয়েছি, হঠাৎ কিনা তুমিই এসে উপস্থিত।'

'আমি অবিলম্বেই আবার অনুপস্থিত হ'বো, আশা করি তাতে

তোদের যাওয়ার রাস্তাটা মসৃণ হবে। এমনিও তো যেতে পারিস একদিন।'

'প্রায়ই ভাবি—শেষ পর্যন্ত একদিনও হয় না', মল্লিকা হেসে ফেললো।

'বাড়ি থেকে মোটে বেরুনোই হয় না বুঝি?' চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো প্রশান্তর মুখ।

ডিমের মধ্যে কুচি-কুচি কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ মিশিয়ে মল্লিকা ঢেলে দিলে প্যানে; গরম ঘিয়ের উপর ছ্যাঁকছ্যাঁকিয়ে উঠলো। শব্দটা থামলে পর বললে: 'বৌদির খবর কী?'

'তাঁর খবরগুলো আপাতত এমন নয় যে রয়টারে বেরুচ্ছে না ব'লে নালিশ করা চলে। কিন্তু তোর ঐ গন্ধে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।'

'এই তো হ'য়ে গেছে।' আঁচলে চেপে মল্লিকা প্যানটা নামালো—একটু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে রাখলে ধোঁয়া-ওঠা হলদে নরম ওমলেট। ছুরি দিয়ে সেটাকে তিন টুকরো ক'রে কেটে বললে: 'জানো প্রশান্ত-দা, সেদিন সুমি-দি এসেছিলো।'

প্রশান্ত বললে: 'তাই নাকি?'

মল্লিকা চায়ের জল চড়িয়ে দিলে—'বেশ লাগলো ওকে।'

'হ্যাঁ, সুমি ইচ্ছে করলে মনোহরণ আলাপ করতে পারে। কুঙ্কুমের চাকরির কথা বললে বুঝি?'

মল্লিকা বাঁ হাতে কপাল থেকে একটা নুয়ে-পড়া চুলের গুছি সরিয়ে স্তিমিতস্বরে জবাব দিলে: 'হ্যাঁ, বলছিলো।'

'তুই কি কিছু বলেছিলি ?'

মল্লিকার চোখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে প্রশ্নটা করলে প্রশান্ত যে মল্লিকার মনে হ'লো সে নিশ্চয়ই না-জেনে কোনো দোষ করেছে, এমন-কিছু বলেছে যা বলা উচিত হয়নি। ভয়ে-ভয়ে বললে: 'আমি তো কিছু বলিনি—সুমি-দিই বললে তোমাকে বলতে। এমন যদি হয় এ নিয়ে সে তোমাকে বিরক্ত করেছে, সেটা আমার দোষ নয়।'

'না, সুমি আমাকে কিছু বলেনি।'

'বলেনি তো!' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মল্লিকা। 'তাহ'লে এত জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'আর কী-কী কথা হয়েছিলো, মনে আছে ?'

'এ-বিষয়ে ? বেশি কিছু নয়। সুমি-দি বললে: "দাদা তো ইচ্ছে করলেই পারেন, দাদাকে বলবো।" আমি বললুম: "প্রশান্ত-দা বলেছেন চেষ্টা করবেন।"'

'তুই বললি ও-কথা, না ?'

মল্লিকা একটু অবাক হ'য়েই বললে: 'কেন, এতে কি কোনো দোষ হয়েছে ? আমি এ-ও হয়তো বলেছিলুম যে তোমার আপিসে কিছু খালি হ'লে আর ভাবনাই থাকে না।'

প্রশান্ত বললে: 'হুঁ।'

'সুমিদিকে আমাদের জন্য এত বেশি চিন্তিত মনে হ'লো যে ও-রকম কিছু বলা দরকার মনে করলুম।'

প্রশান্ত সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে, 'সুমিকে তোদের জন্য বড়ো বেশি চিন্তিত মনে হ'লো—না ?'

এক ঝলকে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে মল্লিকা : 'অবিশ্যি এগুলো কথার কথাই। যদি কোনো কথা বিকৃত হ'য়ে তোমার কানে পৌঁছিয়ে থাকে তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কী যেন হয়েছে।'

বুড়ো আঙুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে প্রশান্ত বললে : 'যা হয়েছে সেটা ভালোই।'

কোনো প্রশ্ন না-ক'রে মল্লিকা বললে : 'এ-সব কথা থাক্, বড়ো বিচ্ছিরি লাগে আমার। চার্লি চ্যাপলিনের নতুন ছবিটা দেখেছো নাকি ?'

'প্রথম দিনেই দেখেছি।'

'আমরাও যাবো শিগগিরই', মল্লিকা নির্ভয়ে বললে, তাদের সাম্প্রতিক সম্পদের কথা ভেবে। 'খুব চমৎকার—না ?'

'আশ্চর্য।'

সিনেমা থেকে বইয়ের কথা উঠলো, প্রশান্ত এক নব্য রুশ লেখকের নাম করলে। তারপর যখন অতি-নতুন বাঙলা কবিতার প্রসঙ্গ চলেছে, ঘটনাস্থলে কুঙ্কুম মিত্রের আবির্ভাব। স্নানান্তে চেহারাটা পরিপাটি হয়েছে, হাতে একটা ঠোঙা। তাড়াতাড়ি স্নান শেষ ক'রে অলক্ষিতে নেমে গিয়েছিলো ; মোড়ের দোকানে গিয়ে কিনেছে গরম শিঙাড়া, আর সন্দেশ, আর গোটাচারেক রসগোল্লা—ও-বস্তুটা মল্লিকার বিশেষরকম প্রিয়। সর্বশেষে মিঠে

পানের খিলিও ভোলেনি। নিজের বুদ্ধি ও সাড়ে-আটআনা পয়সা খরচ ক'রে সে যখন এ-সব খাদ্য হাতে ক'রে প্রশান্তর পিছনে এসে দাঁড়ালো, মল্লিকা তাকে দেখেই ব'লে উঠলো : 'বাঃ!'

প্রশান্ত পিছনে তাকিয়ে বললে : 'এই যে কুঙ্কুম। আচ্ছা, তুমিই বলো তো বাঙলা গদ্য ছন্দ ব্যাপারটা কী?'

প্রশান্ত ব'সে ছিলো দরজাটা প্রায় জুড়ে, বলতে-বলতে পা দুটো গুটিয়ে নিলে। কুঙ্কুম বারান্দায় এসে ঠোঙাটা স্ত্রীর সামনে নামিয়ে রেখে তকতকে মেঝেতে ব'সে পড়লো আসন-পিঁড়ি হ'য়ে। মল্লিকা ঠোঙার ঢাকনাটা খুলে খাবারগুলো একটা থালায় সাজাতে-সাজাতে বললে : 'ভালো করেছো এগুলো এনে। আমি ভাবছিলাম—'

প্রশান্ত বললে : 'করেছো কি কুঙ্কুম! আমাদের চা-পার্টি তো এখানেই জ'মে উঠলো দেখছি।'

মল্লিকা বললে : 'আড্ডা জমানো দিয়েই কথা—সে যেখানেই হোক্।'

'কথাটা অন্যভাবে বলা যায়। আড্ডা যেখানে জমে সে-স্থানই মহৎ। আমার ওখানে', প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে : 'আড্ডাটা তেমন জমবে না আজ। কেন যে মানুষ এ-সব আয়োজন করে জানিনে; করতে হয়।'

মল্লিকা কেৎলি নামিয়ে নিবিয়ে দিলে স্টোভ। মুহূর্তে জায়গাটা যেন অতিশয় শান্ত লাগলো। সকলেরই কণ্ঠস্বর স্বতঃই নেমে এলো নিচু পরদায়।

টী-পটে গরম জল ঢালতে-ঢালতে মল্লিকা বললে : 'এ-সব না-করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হবে কী ক'রে ?'

'অনেক সময় দেখা না-হওয়াটাই হয়তো ভালো।'

চা তৈরি হ'লো। খাদ্যের স্তূপটা প্রথমটায় ভয়াবহই ঠেকেছিলো, কিন্তু চা ও খুচরো গল্পের সঙ্গে কেমন ক'রে যে ও-সব উড়ে গেলো কেউ টেরও পেলো না।

'আর-এক পেয়ালা চা দিই, প্রশান্ত-দা ?'

'আধ পেয়ালা দাও। অল্পের জন্যে আর বাকি রাখি কেন ? সিগারেট, কুঙ্কুম ? শোনো : তোমাকে একটা কথা বলবো মনে ক'রে এসেছিলাম।'

সিগারেট ধরিয়ে কুঙ্কুম অবাক হ'য়ে বললে, 'আমাকে ?'

'সত্যি বলতে, দু'জনকেই। কুঙ্কুম : তোমার জন্যে একটা চাকরি আছে।'

'আমার জন্যে মানে ?'

'মানে, তুমি যদি করো আরকি। আমি সবই ঠিক ক'রে এনেছি।'

ঢিপ্ ক'রে উঠলো একসঙ্গে দু'জনের বুক। মল্লিকা দ্রুতচোখে তাকালো স্বামীর দিকে, আর কুঙ্কুম খুব মৃদুস্বরে বললে : 'আপনার আপিসেই বুঝি ?'

'আমার আপিসেই। আমারই ডিপার্টমেণ্টে একজন লোক দরকার—দরকারটাও আমার সৃষ্টি। সামনের মঙ্গলবার তোমার ইণ্টারভিয়ুর তারিখ।'

'বলেন কী!'

'ইতিমধ্যে তোমাকে একটা রাজবেশ তৈরি করিয়ে নিতে হবে। আমার দরজি আছে, বাকিতে দেবে। নেক্‌টাই বাঁধতে পারো তো?'

'জন্মে ছুঁয়েও দেখিনি।'

মল্লিকা বললে: 'সে-জন্যে ভেবো না।'

প্রশান্ত বললে: 'সে-জন্যে ভাববো না। মল্লিকাই আছে গলরজ্জুবন্ধনে সুনিপুণা। এবারে কাজের কথা। মাইনে তোমাকে আপাতত দু'শো দেবে—'

'দু'শো!' কুঙ্কুম স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

একে তো পঞ্চাশ টাকাতেই কুঙ্কুমের মন আজ মাতাল হ'য়ে আছে, তার উপর এ-কথা শুনে তার ভিতরকার অবস্থাটা একেবারে ডিলিরিয়মে এসে ঠেকলো। দু'শো টাকা! ভাবতে পারে না!

প্রশান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'এই তো কথা। তাহ'লে আমি এবারে পালাই। তোমরা বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

প্রশান্ত উঠে দাঁড়ালো।

'কুঙ্কুম: মঙ্গলবার তোমার ইণ্টারভিয়ুর তারিখ। সামনের পয়লা থেকে যেতে হবে।...আচ্ছা, চলি। মল্লিকা, তোর চা অতি চমৎকার লাগলো।'

পরিক্রমা

প্রশান্ত চ'লে যাওয়ার পরে খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলো। এ-ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, এতই আকস্মিক ও সেই সঙ্গে এতই নিশ্চিত যে···বিশ্বাস করাই শক্ত। মাথাটা ঝিমঝিম করছে দু' জনেরই। মুহূর্তে সব বদ্‌লে গেলো, সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্যা ও সচেষ্টতা, জীবনের আবহাওয়াটাই হ'য়ে গেলো অন্যরকম। হঠাৎ এক কথায় এই অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নেয়া সহজ নয়।

ছায়া গাঢ় হ'লো। মল্লিকা আস্তে একটু ন'ড়ে বললে: 'যাই স্নান করতে। নয় তো ওখানে পৌঁছতে দেরি হ'য়ে যাবে।'

কুঙ্কুম বললে: 'যাক্, ঘুচলো সব ভাবনা।'

'ঘুচলো।'

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

দু'জনের মধ্যে সুখের ভরা জোয়ার। বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠছে—কেমন ক'রে এত সুখ সইবে? ভাগ্য যেন পণ করেছে এই দু'জনকে নিঃশেষে, নিঃশেষে সুখী করবে। কী বলবে তারা? কী করবে তারা? কিন্তু বুকের ভিতরকার এই টনটনানি কেবলই কি অসহ্য সুখের? আজকের এই ছায়া-ক'রে-আসা বিকেলটিকে ব্যথার মতোও লাগছে যেন। গেলো, সব গেলো। তাদের এই ছোট্ট ফ্ল্যাট, এই বারান্দায় ব'সে রান্না, লাল

কৌটোর পয়সা নিয়ে অন্তহীন তর্ক; তাদের অবারিত উন্মুক্ত উন্মথিত দিন-রাত্রি, দায়িত্বহীন চিন্তাহীন অপরূপ অনিয়ম, হালকা নৌকোর মতো সময়ের উপর দিয়ে ছলছলিয়ে চ'লে যাওয়া—সব গেলো। এবার তারা শিকড় গজাবে, এবার তারা রীতিমতো সংসার পাতবে—হবে জিনিসপত্র, হবে ভৃত্য, হবে সামাজিক সম্বন্ধ—সব জড়িয়ে হবে বিস্তৃত ও জটিল পারিপার্শ্বিক, আর তা থেকে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র সমস্যার উদ্ভব—ন'টা বাজতেই আপিসের তাড়া, একদিনও তার অন্যথা হ'তে পারবে না! আজ যেন এক নতুন চোখে তাদের অতি ক্ষুদ্র এই বাসস্থানের দিকে তারা তাকিয়ে দেখলে। এর মেয়াদ ফুরোলো। এটা ছাড়তে পারবে ভেবে মনে-মনে অত্যন্ত খুসি হচ্ছে ওরা, কিন্তু কে জানে, এই হয়তো সব চেয়ে ভালো ছিলো, কে জানে!

৮

পরদাগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফিকে হলুদ রঙে খয়েরি পাড় তোলা, ঠিক যেমন চেয়েছিলো পায়নি, তবে এটাও সুন্দর। পশ্চিমের জানলায় লেগেছে রোদের ঝলক, পরদাটা স্বচ্ছ-সোনালি দেখাচ্ছে, আলোয় তুলে ধরলে শ্যাম্পেন যেমন দেখায়। কত মধুর রঙ আছে পৃথিবীতে। এক-এক সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'তে হয়: নীল কতরকমের, লাল কতরকমের, কত হলদে কত বেগনি কত ধূসর। রঙে-রঙে মিশে এ কী অপরূপ খেলা আকাশ ভ'রে। সেই খেলার আমরা নকল করতে যাই পটে তুলি বুলিয়ে। বড়ো মজার

খেলা। যাকে সবুজ বলি, যাকে নীল বলি সে তো একটা রঙ নয়, কত রঙ মিশিয়ে তাকে ফোটাই। কিন্তু আকাশে ঐ যে একটি অতি কোমল নীলের হ্রদ, পায়রা-নীল, পরী-নীল, স্বপ্ন-নীল —সে কি কখনো ফুটবে কোনো মানুষের তুলিতে? সন্ধ্যার আকাশে এক-এক সময় এমন একটি রঙের ছোপ লাগে যে মনে হয় চিরকালের মধ্যে তাকে আর কখনো দেখা যাবে না, আজকের এই তেরোই এপ্রিল তারিখে মুহূর্তের জন্য আমাদের চোখের সামনে দেখা দিয়েই সে মিলিয়ে গেলো—এর পর চিরকাল ভ'রে কত সন্ধ্যা আসবে, কত রঙ খেলবে আকাশে, কিন্তু এই বিশেষ রঙটি আর কখনোই ফিরে আসবে না। আর কি দেখতে পাবো এই অতি কোমল অনির্বচনীয় নীল, পায়রা-নীল, পরী-নীল, স্বপ্ন-নীল…

একদিন আমি একটা সূর্যাস্তের ছবি আঁকবো, ভাবলে বরুণা।

সোমনাথ ভাবলে, চৌবাচ্চা থেকে ঘটিতে জল তুলে গায়ে ঢালতে-ঢালতে: আমার বইটা একদিন লিখে ফেলতেই হবে। ব্রে। চমৎকার নাম। পৃথিবীতে যত লোক যত বই লিখেছে, এত চমৎকার নাম কেউ দেয়নি। লাখে-লাখে কাটবে। দেদার পয়সা হবে, একখানা বই লিখেই বড়োলোক। তখন আমি

জমকালো দাড়ি রাখবো, কুকুর পুষবো অনেকগুলো আর এগারোটার আগে একদিনও ঘুম থেকে উঠবো না।

দেয়ালের কোনে আলোর একটি ঋজু রেখা, পাশের টীপয়ে রজনীগন্ধার ঝাড় হঠাৎ সোনালি হ'য়ে উঠলো। এ-রঙ মুছে যাবে, তবু রজনীগন্ধা সুন্দর, ঝলোমলো সাদা, মুঠো-মুঠো হাসির মতো: একটু পরেই তো ইলেট্রিক আলো আর সিগারেটের ধোঁয়া, চা-খাবার টুংটাং আর ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো-টুকরো কথা—কিন্তু তারই ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ বুকে এসে লাগবে এদের তীব্র মধুর গন্ধ, তারপর কাল সকালে এরা শুকিয়ে ম'রে গেছে। ঘর ভ'রে গেছে ধারালো গন্ধে, রান্নাঘরের খাদ্য-সৌরভ থেকে এখানে এসে অদ্ভুত লাগছে। রান্নাঘরে সব প্রস্তুত, নতুন চায়ের সেট ঝক্‌ঝক্ করছে। সাড়ে-পাঁচটা হ'লো, বরুণা একবার ঘড়ির দিকে তাকালো, একটু পরেই ওরা আসতে আরম্ভ করবে।

এবারে ওরা এলেই পারে, ভাবলে বাবলি। ভাবনাটা অতি সুখের, কিন্তু দুঃখও তার মধ্যে কম নেই। এলেই তো হ'য়ে গেলো। ওরা সব আসবে, চা খাবে, তারপর চ'লে যাবে—

সঙ্গে-সঙ্গে এই দিনটি অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে কোথায় যাবে হারিয়ে। এক বছরের মধ্যে আর তার জন্মদিন আসবে না, কিন্তু এক বছর পরেও ঠিক এই দিনটি তো ফিরে আসবে না, আসবে আর-একটি দিন। আজকের এই দিন কোথায় যাবে? অনেক দূরে আছে এক মস্ত বন, থমথমে অন্ধকার, কালো-কালো ছমছমে ছায়া-ভরা, সেখানে এই দিনগুলো লুকিয়ে থাকে, কেউ আর তাদের খুঁজে পায় না। অনেক, অনেক দূরে, তার পরে আর পৃথিবী নেই।

সোমনাথ গা মুছতে-মুছতে ভাবলে: এখন আমি বারান্দার কোনে ইজি-চেয়ারে ব'সে ইয়েট্‌স্‌-এর নতুন কবিতা পড়বো। এখনো অনেক আলো আছে আকাশে। আস্তে-আস্তে আলো ক'মে আসবে, মুছে আসবে ছাপার অক্ষরগুলো, তখন আমি হাত বাড়িয়ে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালবো না, চুপচাপ ব'সে থাকবো অন্ধকারে। হয়তো একটু পরে চাঁদ উঠবে।

সাড়ে-পাঁচটা। আপিস থেকে অনেক আগেই ফেরা উচিত ছিলো। কী করছে?

তার আজকের ফ্রকটা বড়ো সুন্দর। বুকে পিঠে গাছ গজিয়েছে, পাতা ছড়িয়েছে, পাখি চলেছে উড়ে। এটা মা দিয়েছেন। বাবা দিয়েছেন সোনালি রঙের জুতো, পায়ে দিলেই নাচতে ইচ্ছে করে। সে দিয়েছে নতুন বথলষ। তার জন্মদিনে জিমিকে এই উপহার দিয়েছে সে। জিমির জন্মদিন কবে কেউ জানে না। জিমির মা-বাপ জানে তো—তারা কোথায়? কেউ জানে না, কোথায় তারা। জিমি মা-বাবাকে ছেড়ে কেমন সুন্দর আছে, সে তো একদিন, একদিনও থাকতে পারে না। তবু তো আজ তার পাঁচ বছর পূর্ণ হ'লো, আর জিমির নাকি মোটে দেড় বছর বয়েস।

চুল আঁচড়াবো, কাপড় পরবো, ফুরফুরে পাৎলা সাদা একটি জামা দেবো গায়ে, ফুল-বাবু সেজে একটি সিগারেট ধরিয়ে আরামে চ'লে পড়বো ইজি-চেয়ারে। সমস্ত দিনের পরে এই সময়টায়… কী আরাম! কী শান্তি! এ-সময় কি নষ্ট করা যায় প্রশান্তর পারিবারিক পার্টির অসহ্য ক্লান্তিতে? সে বসবে কবিতার বই হাতে নিয়ে বারান্দার কোনে। সে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে—

হয়তো দেরি দেখলে বরুণ আবার লোক পাঠাবে—যাবে সিনেমায় —না, সিনেমায় যাবে না—যাবে যেখানে খুসি। অতি সুন্দর গাধাটাকে দেবে চাকরের হাতে পাঠিয়ে। সুমিতা ব'লে এক মেয়ে আসবে সেখানে, তাকে সে আর চোখে দেখতে চায় না, কখনোই আর চোখে দেখতে চায় না, এই হচ্ছে আসল কথা।

'এই যে! এত দেরি করলে কেন?

'বাঃ, সুন্দর হয়েছে ঘরটা।'

'চা কি এখন একটু খাবে?'

'না, না, অনেক চা খেয়েছি। মল্লিকার ওখান থেকে আসছি।'

'একেবারে নিয়ে এলেই পারতে ওদের।'

'জনসঙ্গে তো আজকের সমস্ত সন্ধ্যাটাই ওদের কাটবে, তার আগে একটু ফাঁকা দিয়ে এলুম।'

'তাহ'লে এখন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও গে। ছ'টা বাজতে তো বেশি দেরি নেই।'

'যাচ্ছি। সুখবরটা দিয়েই যাই, কুঙ্কুমের চাকরি হ'য়ে গেছে।'

'এর অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

'জানো—বিজন আজ আপিসে গেছ্‌লো।'

'বুঝেছি। সেই বিলিতি-বি-কম্‌ ভাইয়ের কথা তো?'

'আর-একটাও কথা আছে।'

'থাক্‌, পরে শুনবো সব।'

'হ্যাঁ, পরেই শুনো। আমাদের পরমপ্রিয় সব আত্মীয়রা আসছেন, তাঁদের জন্য প্রস্তুত হইগে।'

'জিম্‌, তোর বাবা কে বল্‌ তো? জিম্‌, তোর মা কোথায়? মা-র জন্য কষ্ট হয় নাকি তোর? এই দুষ্টু—ও-রকম কামড়ায় নাকি, চুপ, চুপ! না, আজ বেড়াতে যাবো না। কাঁদলে হবে কী, আজ যাবোই না কিছুতে। জানিস্‌ না, আজ আমার জন্মদিন যে। দেখবি, একটু পরে কত লোক আসবে, আজ কিন্তু খুব লক্ষ্মী হ'য়ে থাকতে হবে, মনে থাকে যেন। যদি লক্ষ্মী হ'য়ে থাকো, সকলে চ'লে গেলে লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি তোমাকে এ—কটুখানি কেক খেতে দেবো। ইস্‌—চাইলেই বেশি দেবো কিনা, ও-সব তো তোমার খেতে নেই। আজ আমার জন্মদিন ব'লে একটু—খানি পেতে পারো। হুস্‌—কী হ'লো, এই জিম্‌, জি—ম্‌! ও—বুঝেছি! বাবা—!'

যাবো না; যাবো না প্রশান্তর ওখানে। চার মাইল হেঁটে স্বাস্থ্য ভালো করবো। কুস্তিগির পালোয়ান হ'লেও ভবে এসে

একটা-কিছু করতাম। উঃ, মাংসপেশীওয়ালাদের অত্যাচারে জীবন দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছে—মাসিকপত্রের পাতা খোলবার উপায় নেই। বাঙালিরা যদি এখন থেকে সাঁওতালনি বিয়ে করতে থাকে তাহ'লে সাঁওতালের স্বাস্থ্য আর বাঙালির বুদ্ধি মিলে চমৎকার এক জাত তৈরি হ'তে পারে। কিন্তু যদি সাঁওতালের বুদ্ধি আর বাঙালির স্বাস্থ্য হয়?

/

বাবা বাথরুমে গেছেন, এক্ষুনি সবাই আসবে। এবারে সত্যি-সত্যি তার জন্মদিন। ওরা আসবে, ওরা চ'লে যাবে, তারপর শেষ। রোজকার মতোই তাকে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে বিছানায় —রোজকার চাইতে একটু দেরি ক'রে শুতে হয়তো পারবে, এইটুকুই লাভ। মা থাকবেন আজ অনেকক্ষণ তার কাছে, মা-কে সে ধ'রেই রাখবে জোর ক'রে। রোজই ভাবে ধ'রে রাখবে, রোজই ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সে ঘুমোবে না, আজ ভাববে শুয়ে-শুয়ে কেমন সেই কালো থমথমে ছায়া-ছমছমে বন, যেখানে আজকের এই দিনটি রাত দশটা বাজতেই পালিয়ে গেলো। যদি সে কখনো সেই বনে যেতে পারে, আজকের এই দিনকে ঠিক বার করবে খুঁজে, ঠিক চিনতে পারবে। 'এই যে, কেমন আছো?' বাঃ, ভুলে গেলে! তুমি যে আমার পাঁচ বছরের জন্মদিন।' ততদিনে সে অবিশ্যি মস্ত বড়ো হয়েছে, আজকের দিনের তাকে

চিনতে না-পারারই কথা। মস্ত বড়ো হবে সে, তারপর বেরোবে জিমিকে নিয়ে সেই হারানো দিনের বনের খোঁজে, এত বড়ো যে তার শেষ নেই, এত দূরে যে পৃথিবীর সেখানেই শেষ।

আত্মীয়রা আসবেন, তাঁদের সম্বর্দ্ধনায় আমরা প্রস্তুত। মুখে আনবো হাসি টেনে, হাই চাপতে-চাপতে নানারকম কথা উদ্ভাবন করবো, উঠতে চাইলে আর-একটু বসতেও বলবো। স্বাধীনতা! অর্থহীন একটা কথা। মানুষ স্বাধীন নয় কখনোই, সভ্যতা তাকে মেরেছে। আমরা যদি পাখি হতাম, তুমি আর আমি পাখি হতাম যদি!

বরুণা আর-একবার রান্নাঘরে গেলো।

একটি সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ রাস্তায় বেরুলো। হাতে বাক্সয় ভরা সেই শ্বেত গর্দ্দভ। কাল বরুণাকে দেড় টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, ভোলে না যেন। সেই সকাল দশটায় বেরুনো, আর এখনকার বেরুনো! আজকের মতো সে শোধ করেছে জীবিকার ঋণ, এখন সে স্বাধীন…

কেউ স্বাধীন নয়, বরুণা ভাবলে। তোমাকে দেখতে পারিনে, তোমাকে ঘৃণা করি, তুমি আর আমার কাছে এসো না, কোনো সংশ্রব রাখতে চাইনে তোমার সঙ্গে…এ-কথা বলবার স্বাধীনতা তার কোথায়?

এখন সে স্বাধীন, ফুরফুরে বাবু সেজে এই ফুরফুরে হাওয়ায় সে বেরিয়েছে। প্রশান্তর ওখানেই যাচ্ছে। ক্লান্ত হবে, অসহ্য লাগবে…তবু, না-গিয়েই বা করবে কী? শুধু যদি সুমিতা…

কেন আমরা নিজের ইচ্ছেমত থাকতে পারবো না? কী চমৎকার হ'তো, যদি অপ্রিয়দের সঙ্গে সংশ্রব রাখতে বাধ্য না-হতাম। এত রাগ ঘৃণা এত বিদ্বেষ মনের মধ্যে তাহ'লে পুষতে হ'তো না তো। তাহ'লে শুধু যে বেশি সুখী হতাম তা নয়, বেশি ভালোও হতাম।…বরুণা বসবার ঘরে ফিরে এলো।

…শুধু যদি সুমিতা ব'লে কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে না থাকতো!

…শুধু যদি পৃথিবীতে এত মানুষ না-থাকতো! ভাবলে বরুণা। এ কী অদ্ভুত নীতি আমাদের যে আমরা সাপ মারতে পারি, মশা মারতে পারি, স্বার্থের যুদ্ধ বাধিয়ে বহু মানুষও মারতে পারি। শুধু, যে-লোকটাকে দেখলেই আমার সমস্ত শরীর রী-রি ক'রে ওঠে, যে আমার জীবনে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে, বিদ্বেষের সংক্রামণে যে আমাকে অনেক সময় তার মতোই নীচ ক'রে তোলে—তার

মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে আমি বলতে পারবো না : যাও তুমি, তোমার মুখ দেখতে চাইনে !

সোমনাথ এসে পৌঁচেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়ি এসে থামলো তার পিছনে। নামলো সুমিতা, নামলো বুলু আর নন্তু, নামলো বিজন ঘোষ।

'এই যে', বিজন যেতে-যেতে একটু মাথা নাড়লো। এগিয়ে গেলো সে থপ্থপ্ ক'রে অতি-বিরাট ব্যাঙের মতো, গট্গট্ ক'রে তারও আগে গেলো নন্তু বুলু, আর সুমিতা গেলো সাদা মেঘের মতো ভেসে সূক্ষ্ম সুগন্ধ ছড়িয়ে।

সোমনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু অপেক্ষা করলো, ওরা আগে সিঁড়ি পার হোক্।

'ঠিক হাজির আছেন!' বললে বিজন ঘোষ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে।

সোমনাথের হঠাৎ একবার নিঃশ্বাস আটকে এলো, সেই সৌরভে। কী সুন্দর, সে ভাবলে, কী সুন্দর।

পরিক্রমা

।

'দাদার এখানে এসে একটু যে নিজেদের মনে থাকবো তার কি উপায় আছে!' বললে স্নমিতা। 'ঐ সোমনাথ—'

স্নমিতা দরজায় টোকা দিলে।

'ঐ এলো', বললে বরুণা দত্ত

১৯৫২